দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৭ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ২৩ জুন, ২০২৫
৮ আষাঢ়, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭
website : www.eswastika.com

গৌরবময় এগারো বছর

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী পরিচালিত ভারত সরকারের ১১ বছর পূর্ণ হলো। সেই সঙ্গে এই সরকার তার তৃতীয় দফার প্রথম বর্ষ পূর্ণ করলো। বিগত এগারো বছরের শাসনকালে এই সরকারের সাফল্য বিশ্বমঞ্চে প্রশংসিত। দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দেশের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনার নিখুঁত রূপায়ণ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ৮ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৩ জুন - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

২০২৬-এর ভোটে তৃণমূলের বড়ো দুর্বলতা 'মুক আর মুখ'-এর লড়াই 'টেক অফ' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদিকে রাষ্ট্রপতি শাসন চান? ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

এগারো বছরে ঘটেছে বিকাশ, বেড়েছে সম্মান ◻ রাজীব উপাধ্যায় ◻ ৮

তিনবিঘা থেকে শিলিগুড়ি করিডোর : সীমান্তে নতুন আগুন, নিরাপত্তায় শৈথিল্য ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

মহেশতলার ঘটনা জেহাদি সন্ত্রাসের স্ফুলিঙ্গ মাত্র ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৩

মোদীজীর এগারো বনাম দিদির চোদ্দ ◻ পিনাকপাণি ঘোষ ◻ ১৫

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য নতুন বিপদ ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ১৭

ধ্বংসের পথে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ◻ অজয় ভট্টাচার্য্য ◻ ১৯

দেশের মধ্যে থাকা ঘরশত্রুদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন ◻ অমিত কুমার চৌধুরী ◻ ২০

রামবাবু শীল লেনের দত্ত পরিবারের রথযাত্রা ◻ সপ্তর্ষি ঘোষ ◻ ২৩

২০১৪ সালের পর নতুন ভারতের উদয় ◻ নারায়ণশঙ্কর দাশ ◻ ২৪

শ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য চির অমলিন ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৩১

মহাপ্রভু জগন্নাথের ছাপ্পান্ন ভোগ ◻ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ◻ ৩৪

খেলার মাঠে উঠে আসছে মেয়েরা, তাঁরাই নবতন্ত্রের রচয়িতা ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ৩৬

মহেশতলার ঘটনা রাজ্য সরকারের প্ল্যান-এ না প্ল্যান-বি? ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ৩৯

নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের এগারো বছর : বস্তুগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনারও পরিবর্তন ◻ বিমলশঙ্কর নন্দ ◻ ৪৩

পশ্চিমি নারীবাদ ভারতের বিরুদ্ধে এক গভীর সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র ◻ ড. অর্পণ দাস ◻ ৪৬

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻

ফঃ ১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ৩০ জুন ২০২৫

প্রকাশিত হবে ৩০ জুন ২০২৫

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কাছে ড. শ্যামাপ্রসাদ মখোপাধ্যায় একটি আবেগের নাম। তিনি ছিলেন নীতিনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, যথার্থ শিক্ষাবিদ এবং মানবদরদি একজন সমাজসেবী। এর চাইতেও বড়ো কথা, তিনি পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টিকর্তা।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর কর্মময় জীবনের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সুশাসনের একাদশ বর্ষ

ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে বহু বৎসর পর তাহারা নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর ন্যায় একজন সুশাসককে প্রধানমন্ত্রী রূপে পাইয়াছে। তাঁহার পূর্বে অবশ্য অটলবিহারী বাজপেয়ীর ন্যায় রাষ্ট্রপুরুষকে প্রধানমন্ত্রী রূপে দেশ পাইয়াছিল। তাঁহার সময়কালে দেশের উন্নয়ন যাত্রাও শুরু হইয়াছিল। কিন্তু সুশাসনহীনতায় কালযাপন করা জাতি তাঁহার উন্নয়নের মর্যাদাকে অনুধাবন করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রোন্নতি অপেক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাকেই একাংশ দেশবাসী অগ্রাধিকার দিয়াছিল। তাহার ফলেই অটলবিহারী বাজপেয়ী আর দেশসেবা করিবার সুযোগ পান নাই। তৎপরবর্তী একদশক ভারতবাসী পাইয়াছে কংগ্রেস পরিচালিত এক নীতিপঙ্গুত্বের জোট সরকার। দেশ সেবার পরিবর্তে তাহা একটি নির্দিষ্ট পরিবারের সেবায় মগ্ন থাকিয়াছে। সেই পরিবারের প্রধান বকলমে সুপার প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা লইয়া দেশকে সর্বপ্রকারে পশ্চাদপদ করিয়াছেন। দেশবাসী সেই সময় অটলবিহারী বাজপেয়ীর অভাব অনুভব করিয়াছে। অবশেষে ২০১৪ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী রূপে দেশসেবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে দেশবাসী। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকিবার সময়েই তিনি উন্নয়নপুরুষ রূপে অভিহিত হইয়াছিলেন। গুজরাটের উন্নয়ন তখন সমগ্র দেশে 'গুজরাট মডেল' নামে মান্যতা পাইয়াছে। সেই নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত ভারত সরকার গত ২৬ মে একাদশ বৎসর পূর্ণ করিয়াছে। সেই সঙ্গে গত ৯ জুন তাঁহার তৃতীয় ধারা সরকারও প্রথম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। মোদী মন্ত্রীসভার একাদশ বৎসরের যাত্রার মূল সংকল্প হইল দেশবাসীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করা। তাহাতে তিনি বহুলাংশে সফল হইয়াছেন। তাহার জন্যই তিনি দেশবাসীর নিকট বিকাশপুরুষ নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই সময়কালের মধ্যে দেশবাসী অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণ এবং জাতীয় নিরাপত্তার এক নূতন যুগ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। দরিদ্র মানুষদের জন্য এই একাদশ বৎসরে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উজ্জ্বলা যোজনা, পিএম আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, ভারতীয় জনৌষধি কেন্দ্র, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি, স্বচ্ছ ভারত, জনধন যোজনা, মুদ্রা ঋণ, বেটি বাঁচাও—বেটি পড়াও প্রভৃতি প্রকল্পগুলি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। সেই সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা, শক্তিশালী অর্থনীতি এবং দেশবাসীর নিকট প্রযুক্তিকেও সহজলভ্য করিয়াছে এই সরকার। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের অনতিকাল পরেই নোট বাতিল, পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) ন্যায় একাধিক অর্থনৈতিক সংস্কার ঘোষণা করা, ব্যাংকগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার নিমিত্ত বহু কোটি টাকার বিনিয়োগ, পরিকাঠামো উন্নীতকরণ, আর্থিক পরিষেবার পুনর্গঠন এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে দেশকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করিয়াছেন। ইহারই ফলস্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে দেশ রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাংকের স্বর্ণসঞ্চয়ের পরিমাণও দ্বিগুণ হইয়াছে।

একাদশ বৎসর পূর্বে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াই প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে 'অচ্ছে দিন'-এর আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহারা দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে ব্যাহত করিবার জন্য পদে পদে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। নোট বাতিলের ন্যায় একটি কার্যকরী পদক্ষেপকে ব্যর্থ করিবার জন্য কত বিরোধিতাই না তাহারা করিয়াছেন। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করিতে করিতে তাহারা দেশবিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। জাতীয় নিরাপত্তার ন্যায় দিকগুলি— সীমান্ত সুরক্ষা, পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস, মাওবাদ নির্মূলীকরণ অভিযান অথবা সেনাবাহিনীর সাফল্য— সমস্ত কিছুতেই তাহারা প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়াছেন। ইহা পরিষ্কার, পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিহীনতা, নেতৃত্বহীনতা, চূড়ান্ত আর্থিক দুর্নীতি এবং শাসন ব্যবস্থায় যে দিশাহীনতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সেই অবস্থায় বিরোধীরা দেশকে পুনরায় লইয়া যাইতে চাহেন। ইহার ফলও অবশ্য তাহারা পাইয়াছেন। দেশবাসী তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। দেশবাসীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই যে সুযোগ্য, এই একাদশ বৎসরে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, রাজনীতি ভোগের ক্ষেত্র নহে, তাহা ত্যাগের ক্ষেত্র, সেবার ক্ষেত্র।

সুভাষিতম্

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়া সমন্বিতঃ।
যদি দৈবাদ্ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে।।

ফল ও ছায়া সমন্বিত বড়ো বড়ো বৃক্ষের সেবাযত্ন করা উচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে ফল না দিলেও তার ছায়া কেউ আটকাতে পারে না।

২০২৬-এর ভোটে তৃণমূলের বড়ো দুর্বলতা 'মূক আর মুখ'-এর লড়াই

'টেক অফ'

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আহমেদাবাদের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার বিদেহী আত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই লেখা। তাই এই রাজনৈতিক লেখায় ইচ্ছাকৃতভাবেই বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'টেক-অফ' ও 'ল্যান্ডিং' শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো কোন দলের টেক অফ, আর কারই-বা ল্যান্ডিং? ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটে তৃণমূলের মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খানিকটা নিরুপায় হয়েই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা ঘোষণা করেছেন। মমতা স্বাভাবিক মুখ হলে ঘোষণার প্রয়োজন হতো না। অভিষেক যে মুখ হবেন না, নরেন্দ্র মোদী শাসিত ভারতের প্রতিনিধি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা বুঝিয়েছেন। প্রতিনিধিদলে থেকে সাংসদ অভিষেক ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ভূয়সী প্রশংসা করলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার প্রস্তাব থেকে শব্দ দু'টি বাদ দিয়েছেন।

সাংগঠনিক রাশ অভিষেকের হাতে। এবারেও তৃণমূলের তরী পারের দায়িত্ব রয়েছে অভিষেকের আমদানি আইপ্যাক সংস্থার হাতে। তাই তৃণমূলের মুখ মমতা আর দেহ অভিষেক। ২০২১-এর ভোটে তৃণমূলের নতুন বিধায়ক ছিলেন ৬৪ জন। এবারের প্রার্থী তালিকা থেকে তৃণমূল নাকি তাদের ১০০ জন বিধায়ককে বাদ দিতে চলেছে। মুখবদলের এই খেলা প্রমাণ করে যে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল মোটেই স্বস্তিতে নেই। দলের একটা বড়ো অংশের কাছে আইপ্যাকের পেশাদারিত্ব অস্বস্তির। ২০০০ সালে বিদেশি বামেরা বুঝে গিয়েছিল জ্যোতি বসুকে দেখলেই লোকে পালাচ্ছে। তাই মুখ পালটে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে আসা হয়। বসু তার পঞ্চম মুখ্যমন্ত্রিত্বের মেয়াদ শেষ করতে পারেনি। তার আগেই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে দেওয়া হয়। ২০১১ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার ১৫ বছর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেমন দুরবস্থা যদিও নয়। তৃণমূল তার নামেই একটি ছোটো ফ্যান ক্লাব দল। সেখানে ভঙ্গ দেহ তৈরি হলেও মুখ তৈরি হয় না। সেখানে মূক-বধিরের সংখ্যাটাও অধিক। যারা কোনোভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেকের বিরুদ্ধাচরণ করে না।

ত্রিবঙ্গে (উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ) ত্রিফলা আক্রমণ শানানোর জন্য বিজেপি-র মুঠোয় একাধিক মুখ রয়েছে। তাঁরা দলীয় স্তর ও ভোটার— উভয়ের কাছেই বেশ জনপ্রিয়। ২০২৪ সালের আগে পরে ৬টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে কাউকে মুখ না করেই বিজেপি বিপুল ভোটে জেতে। পশ্চিমবঙ্গ তাই ব্যতিক্রম নাও হতে পারে। এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে মিম ও হাস্যকৌতুকের পরিবেশন। সাধারণ মানুষের কাছে তা একটি বিশেষ সম্প্রদায় তোষণকারী ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। 'ম'-এর লক্ষ্মণরেখায় এবার যুক্ত হয়েছে 'মহেশতলা'।

রাজ্যের গ্রাম আর জেলাগুলি মিলিয়ে প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ ভোট দিতে আসেন না। হয়তো জোর করে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। কলকাতার ১১টি আসনে ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ মানুষ ভোট দেন না। তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিম' উপভোগ করেন, আর টেবিলে বসে বা চায়ের দোকানে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে ভোট দেন না। অনেকেরই ধারণা ৫টি মেয়াদের পর জ্যোতিবাবুকে দেখে যেমন লোক পালাচ্ছিল, ভোটের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে দশা হবে। আর সেটা বুঝে অভিষেক আগেভাগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃণমূলের মুখ হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছে। রাজ্য বিজেপি-র এখন টেক অফের সময় এসেছে। বিরোধীদের বোঝা দরকার তৃণমূলের ভিতর আর বাইরের দু'টো ইঞ্জিন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এরপরও তৃণমূল উড়তে পারে যদি তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন না গড়ে ওঠে, এবং রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-র বুথভিত্তিক সংগঠন মজবুত না হয়।

২০২১-এর পর তিনটে (পুরসভা, পঞ্চায়েত ও লোকসভা) ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে পালটানোর সুযোগ ছিল না। তাই ২০২৬-এ বিজেপিকে টেক অফের পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে। প্রায় তিন দশক পর বিজেপি দিল্লি ও ওড়িশা দখল করেছে। সংসদে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের যখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তখনও রাজধানী দিল্লি বিজেপির হাতের বাইরে ছিল। ২০২৬ সালে বিজেপি সঠিকভাবে টেক অফ করলে তবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্র্যাশ ল্যান্ডিং হবে। আর তা না হলে বিজেপিকে কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সমেত চার রাজ্য— অসম, কেরালা, তামিলনাড়ু ও কেন্দ্রশাসিত পুদুচেরিতে ভোট। আসাম ছাড়া তিনটি বড়ো রাজ্যেই অ-বিজেপি সরকার রয়েছে। বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তামিলনাড়ুর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও বড়ো লড়াই। ভারতের উত্তর, মধ্য, পশ্চিম, পূর্ব প্রান্তের বিভিন্ন রাজ্যে শক্তিশালী সংগঠন থাকলেও বিজেপি এককভাবে কখনো বিহার জেতেনি। আগামী নভেম্বরে সেখানে ভোট। সেই ভোট খানিকটা বলে দেবে ২০১১-তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিমান উড়িয়েছিলেন, ২০২৬-এ বিজেপি তার ক্র্যাশ ল্যান্ডিং ঘটাতে পারবে কিনা।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদি কি রাষ্ট্রপতি শাসন চান?

বদলেষু দিদি,

এই সম্বোধন আপনার ১৪ বছরের পুরনো একটা কথার জন্য। ক্ষমতায় এসেই সেই যে বলেছিলেন না, 'বদলা নয়, বদল চাই'। কিন্তু দিদি পশ্চিমবঙ্গ কি সত্যিই বদলেছে? না, না গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো রেল কিংবা বিশ্ব বাংলা গেটের বদলের কথা বলছি না, পশ্চিমবঙ্গের ভোট সংস্কৃতি কি বদলেছে দিদি?

এখন এই রাজ্যের মানুষের প্রশ্ন, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে কি বিধানসভা নির্বাচন হবে? আসলে দিদি, বাঙ্গালি হিসেবে লজ্জা লাগলেও একটা কথা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে পশ্চিমবঙ্গ এখনও পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে। বামফ্রন্ট জমানায় এ রাজ্য যেভাবে সন্ত্রাস দেখেছে, তেমনটাই দেখে চলেছে এখনও। বেড়েছে বই কমেনি। তৃণমূল জমানার ১৪ বছরে এই রাজ্যে একটা নির্বাচনও হয়নি রক্তপাত ও মৃত্যু ছাড়া।

এমনটা দেশের অনেক রাজ্যেই এক সময়ে ছিল। বিহার, উত্তরপ্রদেশে তো ভোট মানেই ছিল 'মৃত্যু'। কিন্তু টিএন সেশন জাতীয় নির্বাচন কমিশনার হওয়ার পরে ১৯৯১ সাল থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। সব রাজ্যে নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করাতে সফল হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা পারেনি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে পঞ্চায়েত, পুরভোটে আদ্যিকালের ব্যালট ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন আপনি। বামফ্রন্ট জমানার ট্র্যাডিশন বজায় রেখে লুঠপাট, মারপিট, রক্ত, বোমা, হত্যা, এমনকী ব্যালট খেয়ে নেওয়াও দেখেছে এই রাজ্য। আর ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে বাম জমানাকে বলে বলে গোল দেওয়া দেখিয়ে দিয়েছে তৃণমূল।

এটা মানতেই হবে যে, আপনি তথা আপনার প্রশাসন এবং দল কখনোই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে দিতে রাজি নয়। এর উপরে আবার কেন্দ্রীয় সরকার যখন দেশের খরচ কমাতে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' চালু নিয়ে আলোচনা করছিল, তখনই আপনি বলেছিলেন আসলে রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার।

আসলে দিদি আপনি জানেন, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ভোট হলে আপনি বেশি সুবিধা পাবেন। সেটা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও জানে। 'নীতিগত'ভাবেও বিজেপি কোনো নির্বাচিত সরকার ফেলে দেওয়ার বিপক্ষে। কারণ, তাতে যে দলের সরকার ফেলা হবে, তারা 'শহিদ'-এর মর্যাদা পেয়ে যাবে এবং তার ফয়দা তোলার অবকাশ পাবে নির্বাচনে। বিশেষ প্রয়োজনে রাজ্য সরকার ফেলে দেওয়ার ধারা সংবিধানে দেওয়া থাকলেও এই পদক্ষেপকে মূলত 'অগণতান্ত্রিক' বলেই মনে করে বিজেপি। ফলে বিজেপি চাইবে না তৃণমূল তথা আপনি সেই সুযোগ পেয়ে যান।

দিদি, আপনি এটা ভালোই জানেন যে, অটলবিহারী বাজপেয়ী বা নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে কোনো রাজ্যেই অবৈধ উপায়ে বা বিনা কারণে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেনি। মণিপুরের ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন ছিল। তাতে কোনো আপত্তিও ওঠেনি। তবে অনেক রাজ্যের সরকার ভেঙে দেওয়ার নজির দেখিয়েছে কংগ্রেস। ইন্দিরা গান্ধী তো বটেই, পিভি নরসিমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে অনেক রাজ্যেই বিজেপি সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তবে বিজেপি সে পথে কখনও হাঁটেনি।

> **একের পর এক ইস্যুতে কোণঠাসা তৃণমূল মরণকামড় দিতে চাইবে ভোটে। পুলিশকে কাজে লাগাবে আরও বেশি করে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও অতীতের মতোই 'খেলা হবে'-র পরিকল্পনা তৈরি। কিন্তু অতীতের মতো তৃণমূল খেলতে পারবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে।**

ভারতের সংবিধান কী বলছে? সংবিধানের অষ্টাদশ অধ্যায়ে কোনো রাজ্যে ৩৫৬ বা ৩৫৫ ধারা বা অনুচ্ছেদ জারি সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। দেশে বা দেশের কোনো প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে ভারতীয় সংবিধান। ৩৫৬ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো রাজ্য সরকার সংবিধানসম্মতভাবে রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা না করলে সেই মন্ত্রীসভাকে সরিয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যেতে পারে। আর ৩৫৫ ধারা বলছে, বাইরের আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে রক্ষা করতে কেন্দ্র বাধ্য এবং সংবিধান অনুযায়ী রাজ্য চালাতে রাজ্য সরকারের যা যা সাহায্য প্রয়োজন, তা দিতে কেন্দ্রীয় সরকার দায়বদ্ধ। অর্থাৎ, একটি জোর করে এবং অপরটি রাজ্যকে সাহায্য করার জন্য। এক্ষেত্রে তাই রাজ্য চাইলে তবেই ৩৫৫ ধারা জারি করা যায়। কিন্তু ওই কাজ করলেই আপনি কান্নাকাটি শুরু করে বাঙ্গালির মন জিতে নিতে চাইবেন।

কিন্তু দিদি, এই দাবি ঠিকই যে, পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ পরিস্থিতিতে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। অতীতে হয়নি। ২০২৬ সালে আরোই হবে না। কারণ এবারে আপনার দল তৃণমূল বেশি চাপে। একের পর এক ইস্যুতে কোণঠাসা তৃণমূল মরণকামড় দিতে চাইবে ভোটে। পুলিশকে কাজে লাগাবে আরও বেশি করে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও অতীতের মতোই 'খেলা হবে'-র পরিকল্পনা তৈরি। কিন্তু অতীতের মতো তৃণমূল খেলতে পারবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। হ্যাঁ দিদি, আপনার ভাইয়েরাই বলছেন, এবার অত সোজা হবে না। কারণ, মানুষ আর চাইছে না। একমাত্র মানুষই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। □

অতিথি কলম

রাজীব উপাধ্যায়

এগারো বছরে ঘটেছে বিকাশ, বেড়েছে সম্মান

ভারতীয় অর্থব্যবস্থা জাপানকে পিছনে ফেলে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থব্যবস্থায় স্থান করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (আইএমএফ) -এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের জিডিপি এখন ৪.১৮৭ ট্রিলিয়ন ডলার। এই আর্থিক বিকাশের কারণে ভারত বিশ্বস্তরে দ্রুত বর্ধনশীল প্রমুখ অর্থব্যবস্থার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এই বিকাশের যাত্রাপথে বিভিন্ন বিশ্বজনীন সমস্যার দরুন ভারতীয় অর্থব্যবস্থা নমনীয়তা ও অনুকূলতার প্রদর্শন করে, যার মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারী, সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যঘাত এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনাও রয়েছে।

আর্থিক বিকাশে কৃষি ও উৎপাদনের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্র ছাড়াও ভারত পরিষেবা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রটি যে শুধু অর্থব্যবস্থাকে সৃজনশীল বৈচিত্র্য প্রদান করে তা নয়, বরং বিকাশের বাহক এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রশমন ব্যবস্থা প্রদানের সঙ্গে ভারতকে বিশ্বের উৎপাদন কেন্দ্র বানানোর স্বপ্নকেও সার্থকতা প্রদান করে।

অর্থব্যবস্থার স্তম্ভ

ভারতীয় অর্থব্যবস্থা গত কয়েক দশক ধরে দেশবাসীর সেবা অভিমুখী। এখন জিডিপিতে পরিষেবা ক্ষেত্রের যোগদান প্রায় ৫৪ শতাংশ, উদ্যোগে ১৭.৪ শতাংশ এবং বাকি ১৮.৮ শতাংশ যোগদান কৃষিক্ষেত্রের। পৃথিবীর উন্নত দেশের তুলনায় ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বিকাশপথ কিছুটা ভিন্ন। উন্নত দেশের আর্থিক বিকাশে উৎপাদন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু ভারতের অর্থব্যবস্থা কৃষিনির্ভর। এখানে মাথাপিছু আয় খুবই কম ছিল এবং উৎপাদন ক্ষেত্রেও ঠিকমতো অগ্রগতি হয়নি, তাই ভারতীয় অর্থব্যবস্থা উন্নত দেশের 'ব্যাক-অফিস' হয়ে পরিষেবা নির্ভর অর্থব্যবস্থা হয়েই থেকে যায়। একদিকে পরিষেবা ক্ষেত্র ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আবার অপরদিকে এটাই তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাবনাকে সীমিত করে দেয়। যদিও জিডিপিতে কৃষিক্ষেত্রে যোগদান কমেছে, কিন্তু এখনও এই উপার্জন, খাদ্য সুরক্ষা এবং গ্রামীণ জীবিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ৪২ শতাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত, যার মধ্যে ফসল উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ এবং বনায়নও রয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে ভারতের কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানি ৬.৪৭ শতাংশ বেড়ে ৫১.৯১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যায়। এই বৃদ্ধিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই পর্যন্ত দেশের সার্বিক রপ্তানি প্রায় স্থির থাকে। যদিও তথ্য অনুসারে ২০২২-২৩ সালের রেকর্ড ৫৩.১ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা কম, কিন্তু ২০২৩-২৪ সালের ৪৮.৮ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় বেশি।

পরিষেবা ক্ষেত্র : বিকাশ ইঞ্জিন

বিগত তিন দশকে পরিষেবা ক্ষেত্র ভারতের প্রাথমিক আর্থিক চালক হিসেবে উঠে আসে। সমস্ত ঘরোয়া উৎপাদনে (জিডিপি) প্রায় ৫৪ শতাংশ যোগদান ছাড়াও এই ক্ষেত্র ৩০ শতাংশের বেশি শ্রমগোষ্ঠীকে রোজগার প্রদান করে। এই ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি, আর্থিক পরিষেবা, দূরসঞ্চার, খুচরা ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্য অনেক পেশার কাজ রয়েছে। আইটি ক্ষেত্র বার্ষিক ২৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি রাজস্ব প্রদান করে, যার মধ্যে টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো এবং এইচসিএল-এর মতো কম্পানি বিশ্বস্তরে দ্রুত ঘটে চলা ডিজিটাল পরিবর্তন এবং নিত্যনতুন উদ্ভাবনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই ক্ষেত্রটি সফ্টওয়্যার উন্নয়ন থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ক্লাউড কম্পিউটারিং এবং সাইবার সুরক্ষা সমাধানের সঙ্গে আধুনিক পরিষেবাগুলিও উন্নত হয়। বর্তমান বৈশ্বিক আইটি আউটসোর্সিং বাজারে ভারতের অংশগ্রহণ ৫৫ শতাংশ। ভারতীয় কম্পানিগুলি ২০০-রও বেশি দেশে রপ্তানি করে থাকে। এই ক্ষেত্রটি ৫৫-৬০ লক্ষ লোকের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয়, যার মধ্যে ৪৫ লক্ষ লোক সরাসরি যুক্ত। এই বছর এই ক্ষেত্র ৪-৪.৫ লক্ষ লোককে কাজ দেয়।

আর্থিক পরিষেবা : ডিজিটাল বিপ্লব

আর্থিক ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ হয়েছে, যাতে ডিজিটাল লেন-দেন প্রণালী, আর্থিক প্রযুক্তির নতুন নিয়ম এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে সংস্কার আর্থিক সমাবেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জিডিপিতে এর যোগদান ৭.৪ শতাংশ। ভারতে ডিজিটাল বিপ্লব অত্যন্ত সফল। বিশেষ করে ইপিআই লেন-দেন প্রতি মাসে হাজার কোটি টাকারও বেশি হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা অনুযায়ী ৯ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত ৫৫.২৮ কোটি মানুষ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলে। এই যোজনা মানুষকে ব্যাংকিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করে, যার মধ্যে রুপে কার্ড, সুদ ও ডিবিটির মাধ্যমে সরকারি যোজনার প্রত্যক্ষ লাভ সম্মিলিত রয়েছে। বর্তমানে আর্থিক প্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়ে ভারত অগ্রগণ্য। ফিনটেক স্টার্টআপ ফান্ডিং এবং ইউনিকর্নের বিষয়ে আমেরিকা ও চীনের পরই ভারত রয়েছে। আর্থিক প্রযুক্তি বিপ্লব ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে পাশে সরিয়ে মোবাইল ফর্স্ট বিত্তীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহযোগিতা করেছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং লেনদেন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভারতে ২৫০০-র বেশি ফিনটেক স্টার্টআপ রয়েছে, যা আমেরিকার ঠিক পরেই।

ম্যানুফ্যাকচারিং : শিল্পক্ষেত্রের মেরুদণ্ড

উৎপাদন ক্ষেত্র আর্থিক বিকাশে এক মুখ্য চালক রূপে উঠে এসেছে, যা জিডিপি, রোজগার ও রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ যোগদান দেয়। এতে কাপড়, ফার্মাস্যুটিকালস, বাহন, রসায়ন, ইস্পাত ও ইলেকট্রনিকসের মতো প্রমুখ উদ্যোগ রয়েছে। বিগত এক দশকে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছে, যা নীতিগত সংস্কার, প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং প্রমুখ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্রে রণনীতিক নিবেশ দ্বারা প্রেরিত। বিশেষ করে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'

উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত উৎসাহমূলক যোজনা এবং পরিকাঠামোগত বিকাশের মতো সরকারি পদক্ষেপের কারণে এই ক্ষেত্রে গতি বেড়েছে। এই কারণে এই ক্ষেত্রটি আর্থিক পরিবর্তনের ভিত্তি রূপে দেখা দিয়েছে এবং ভারতকে চতুর্থ সর্ববৃহৎ অর্থব্যবস্থা রূপে তৈরি করার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গত ৫ বছরে এই ক্ষেত্রটি বার্ষিক গড় ১২.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হয়েছে, যা বৈশ্বিক উদ্যোগ বিকাশের হার থেকে অনেকটা আগে রয়েছে এবং ভারতকে আর্থিক নমনীয়তা প্রদান করে। ২০২৫ সালে উদ্যোগ ক্ষেত্র প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার বা ৮৩ লক্ষ কোটি টাকা উল্লেখযোগ্য স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। জিডিপি-তে এর যোগদান প্রায় ১৭ শতাংশ এবং এটি দেশের আর্থিক বিকাশ, রপ্তানি ও রোজগার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বস্ত্র ও পরিধেয় : ভারতের বস্ত্র শিল্প সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের মধ্যে একটি, যা দেশের মোট রপ্তানির করের প্রায় ১১ শতাংশ যোগদান করছে। এই ক্ষেত্রটিতে সুতি বস্ত্র, সিন্থেটিক, পাট, রেশম ও উলের উৎপাদন যুক্ত রয়েছে, যা প্রায় ৪.৫ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ১০ কোটি মানুষ পরোক্ষভাবে এই রোজগারের সঙ্গে যুক্ত। ইনভেস্ট ইন্ডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৯ সালে এই ক্ষেত্রটির আকার ৫২.৭ বিলিয়ন ডলার ছিল, যা এই বছর প্রায় ৯২.৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৭.৭ লক্ষ কোটি টাকা হওয়ার অনুমান রয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে বস্ত্র রপ্তানি ৬৫ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। ২০৩০ পর্যন্ত ঘরোয়া ও রপ্তানি, দু'টি মিলিয়ে ভারতীয় বস্ত্র উদ্যোগের পরিমান ৩৫০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কাঁচামালের জোগান, দক্ষ শ্রমিক, প্রতিস্পর্ধী মূল্য নির্ধারণ এবং সারা বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে জোগান বস্ত্র ও পরিধেয় শিল্প ক্ষেত্রের শক্তি। এই উদ্যোগে প্রমুখ স্থানে তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক রয়েছে। যদিও বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ, চীন, ভিয়েতনামের মতো কিছু দেশ পাল্লা দিচ্ছে। তবে বাংলাদেশের রেডিমেড কাপড়ের আমদানির বিষয়ে ভারত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, যার ফলে ছোটো খাটো উদ্যোগগুলি লাভান্বিত হচ্ছে।

ফার্মাসিউটিক্যালস : ভারতকে 'বিশ্বের ফার্মেসি' বলা হয়, কেননা বিশ্বের চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ ভ্যাকসিনের জোগান দেয় এবং সারা বিশ্বে জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে ২০ শতাংশ যোগদান রয়েছে। এর জন্য সারা পৃথিবীতে সস্তা ও গুণমানসম্পন্ন ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে। ভারত ইউনিসেফকে ৫০-৬০ শতাংশ ভ্যাকসিনের জোগানের পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিপিটি ভ্যাকসিনের ৯৯ শতাংশ এবং বিসিজি ভ্যাক্সিনের ৫২ শতাংশ বৈশ্বিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রের বার্ষিক কারবার ২০২৩-২৪ এ ৫০ আরব ডলার অর্থাৎ ৪.১৭ লক্ষ কোটি ছিল। এই ক্ষেত্রটি বার্ষিক ৭-১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত আমেরিকা ইউকে, বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল-সহ ২০০-র বেশি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে। আমেরিকার জেনেরিক ওষুধ প্রয়োজনের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং ইউকের ২৫ শতাংশ জোগান ভারত দেয়।

অটোমোটিভ ক্ষেত্র : ভারতের অর্থব্যবস্থায় বাহন উদ্যোগ বড়ো উদ্যোগের মধ্যে একটি। আমেরিকা (৭৮ লক্ষ কোটি টাকা) ও চীনের (৪৭ লক্ষ কোটি টাকা) পরে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় সবচেয়ে বড়ো বাহনের বাজার। ২০১৪তে এর আকার ৭.৫ লক্ষ কোটি ছিল, যা বর্তমান সময়ে তিন গুণ বেড়ে প্রায় ২২ লক্ষ কোটি হয়ে গেছে। রোজগার প্রদানে এই ক্ষেত্রটি অগ্রণী রয়েছে। এখন প্রায় ৪.৫ কোটি লোক এর সঙ্গে যুক্ত। দেশে মধ্যম বর্গের বিকাশ, দ্রুততার সঙ্গে নগরায়ন, বৈদ্যুতিক বাহনের জন্য সরকারি সমর্থন এবং তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার মতো রাজ্যে স্থাপিত উদ্যোগ পরিস্থিতির তন্ত্র ভারতকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রসায়ন ও পেট্রোকেমিক্যাল : ভারতের পেট্রোকেমিক্যাল উদ্যোগ অর্থব্যবস্থাতে ৬ শতাংশ যোগদান করছে। ভারত বিশ্বের ষষ্ঠ সবচেয়ে বড়ো এবং এশিয়ার তৃতীয় রসায়ন উৎপাদক দেশ। রপ্তানিজাত দ্রব্যের মধ্যে এর অংশগ্রহণ ১৫ শতাংশ। বর্তমানে ভারত ১৭৫ টি দেশে রসায়ন রপ্তানি করে। ৫০ লক্ষ লোককে রোজগার দেওয়া এই ক্ষেত্রটি ২০২৪ সালে প্রায় ২২০ বিলিয়ন ডলারে থাকলেও আজ তা ৩০০ বিলিয়ন ডলারে (প্রায় ২৫ লক্ষ কোটি টাকা) পৌঁছেছে। সরকারের নীতি, বিনিয়োগ এবং ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীণ চাহিদা অনুযায়ী ২০৪০ সালে ১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারে।

আগামীর উদীয়মান ক্ষেত্র

ডিজিটাল অর্থব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি : ২০২৯-৩০ পর্যন্ত শুধুমাত্র কৃষি ও উদ্যোগের মতো পারম্পরিক ক্ষেত্র থেকে আগে এগিয়ে যাবে, বরং জাতীয় আয়ে ২০ শতাংশ যোগদান করার অবস্থায় চলে যাবে। ২০২২-২৩এ জিডিপিতে ডিজিটাল অর্থব্যবস্থার যোগদান ১১.৭৪ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১৩.৪২ শতাংশ হয়েছে। এতে ১.৪৭ শতাংশ লোক কার্যরত ছিল, যা দেশের মোট শ্রমশক্তির ২.৫৫ শতাংশ। এর মুখ্য বিকাশ ক্ষেত্রে এআই, ডিজিটাল প্লাটফর্ম, ক্লাউড, ইন্টারনেট, টেলিকমিউনিকেশন প্রভৃতির পাশাপাশি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। এআই গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীতে১১তম এবং এআই পরিকাঠামোতে ১৬তম স্থানে রয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তি : ভারতের নবায়ন শক্তি ২০১৪ সালে ৭৫ গিগাওয়াট ছিল, বর্তমানে তা তিনগুণ বেড়ে ২৩২ গিগাওয়াট হয়েছে। ২০৩০ পর্যন্ত লক্ষ্য ৫০০ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি এবং ২০৭০ পর্যন্ত শূন্য নির্গমন ঘটবে। স্বচ্ছ শক্তির ক্ষেত্রে সৌর, বায়ু, হাইড্রোজেন ও শক্তি ভাণ্ডার প্রযুক্তিতে বড়ো পরিমাণে লগ্নি টানছে, যার ফলে রোজগারের নতুন দিক খুলে গেছে এবং ঔদ্যোগিক নতুন তন্ত্র গড়ে উঠছে। সৌর বিদ্যুৎ শক্তি

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

উৎপাদনে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। সৌর ও বায়ু শক্তিতে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সৌর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ২০১৪ সালে ২.৮ গিগাওয়াট থেকে ২০২৫ সালে ১০৮ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত ১৫০ গিগাওয়াটের লক্ষ্য রয়েছে। বায়ু বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে ২০১৪ সালে ২১ গিগাওয়াট ছিল যা বর্তমানে ৫১ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে। নবায়নযোগ্য শক্তিকে উৎসাহ প্রদানের জন্য ৫৯ টি সৌরপার্ক নির্মাণে সবুজসংকেত আসার সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটের ৩০ গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন হাইব্রিড সৌর-বায়ু পরিযোজনা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প হিসেবে উঠে আসছে।

শিক্ষা প্রযুক্তি এবং দক্ষতা বিকাশ : অ্যাড-টেক ক্ষেত্রে অনলাইন শিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম, দক্ষতা বিকাশ কার্যক্রম এবং পেশাগত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে প্রথাগত স্বীকৃতি লাভের বিষয়েও গতি এসেছে। এই ক্ষেত্রটি নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশের আবশ্যকতাও পূরণ করছে।

জনসংখ্যাগত লাভ এবং নগরায়ণ

ভারতের জনসংখ্যাগত লাভ ২৮ বছর গড় আয়ুর সঙ্গে আর্থিক বিস্তারের পর্যাপ্ত জনবল প্রদান করে। দ্রুততার সঙ্গে হওয়া নগরায়ণ, নতুন নতুন উপভোগের ধরন, মূল পরিকাঠামোর চাহিদা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে সুযোগ করে দিচ্ছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত নগরীয় ভারতের জিডিপিতে ৭৫ শতাংশ যোগদানের আশা রয়েছে, যদিও ৪০ শতাংশ জনগণ শহরেই বাস করে। নগরীয় ক্ষেত্রে জনসংখ্যা প্রতি বছর ২.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রমবল হিসেবে ১৫-৬৪ বছর প্রায় ৭০ শতাংশ লোক দেশের বিকাশে অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে তাদের অধিকাংশই ডিজিটাল প্রক্রিয়ার কাজে সক্ষম। এসবই ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণে হচ্ছে। যদি এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে ভারতের কাজে লাগানো যায় তবে ২০৭৫ সালের পরে আসা যে কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়ার জন্য দেশ তৈরি হয়ে যাবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইওটি, ব্লকচেন, রোবোটিক্স এবং ৫জি প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারত চতুর্থ ঔদ্যোগিক বিপ্লবের দিকে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। উদ্যোগ স্মার্ট ফ্যাক্টরির ধারণাকে লাগু করছে, তবে পরিষেবা ক্ষেত্রে উৎপাদকতা এবং গ্রাহক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য স্বচালন এবং ডেটা এনালেটিক্সের লাভ তুলছে। ভারত ২০৪৭ পর্যন্ত বিকশিত দেশ হওয়ার জন্য সমাবেশক অর্থব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। এর জন্য উপযুক্ত নির্দেশিকা এবং যোজনার প্রয়োজন হবে, যা এই প্রযুক্তির সমাবেশী প্রয়োগের জন্য আগ্রহ নির্মাণ করে। আজ ভারতে প্রাকৃতিক পরিবেশগত স্থিরতা, নিরন্তর বিকাশ এবং হরিৎ অর্থব্যবস্থা আর্থিক নিয়োজনের অভিন্ন অঙ্গ হয়ে উঠছে, যাতে হরিৎ বিত্ত, কার্বন বাজার এবং বৃত্তীয় অর্থব্যবস্থার ধারণার উন্নতি ঘটছে।

সরকারি পদক্ষেপ এবং নীতিগত পরিকাঠামো

সরকারের আর্থিক বিকাশ এবং ক্ষেত্রীয় বিকাশে গতি আনার জন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর্থিক বিকাশকে গতি দেওয়ার জন্য পরিবহন, বিদ্যুৎ, নগরীয় কাঠামো এবং ডিজিটাল কানেকটিভিটির বিকাশে ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার লগ্নির যোজনা রয়েছে। উৎপাদনের কাজে উৎসাহ প্রদানের পরিকল্পনার (পিএলআই) উদ্দেশ্য ২৬ আরব ডলারের সঙ্গে ১৪ টি ক্ষেত্রে উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান করা। ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন প্রযুক্তি গ্রহণ করে সরকারি পরিষেবা পৌঁছানো এবং দক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে। আধার, ডিজিলকার, ই-হসপিটাল, ই-সঞ্জীবনী (টেলিমেডিসিন), উমঙ্গ অ্যাপ এবং অনলাইন পেনশনের মতো পরিষেবা ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছে। এসবের কারণে ভ্রষ্টাচার, ভৌগলিক বাধা এবং কাজের শিথিলতা কমেছে। একইভাবে জিএসটি, দেউলিয়া ও দেউলিয়া নির্দেশিকা এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুবিধার মতো নির্দেশাবলীতে সংস্কার লগ্নির পরিবেশকে উন্নত করে। মূল পরিকাঠামোগত বিকাশ, দক্ষতা বিকাশ ও নতুন উদ্যোগের পরিস্থিতি তন্ত্র নির্মাণে সরকারের নজর আর্থিক বিকাশের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি নির্মাণ করছে।

সমস্যা ও সুযোগ

উল্লেখযোগ্য প্রগতি সত্ত্বেও ভারতে আয় বৈষম্য, বেকারত্ব, পরিকাঠামোর অভাব, পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তা এবং নিয়মিত প্রযুক্তির উন্নতির আবশ্যকতার সঙ্গে বহু আর্থিক বাধারও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়া কৃষিকাজে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ঘাটতি এবং বৈশ্বিক আর্থিক অনিশ্চয়তা সমস্যা হিসেবে রয়েছে। ভারতকে বুঝতে হবে যে, আমেরিকা ও ইউরোপ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং বেকারত্বের কারণে তাদেরনীতি খুব দ্রুত পরিবর্তন করছে। অতএব ভারতকেও একথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হবে।

পিএলআই এবং স্টার্টআপ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তো হয়েছে, কিন্তু সরকারকে এটাও বুঝতে হবে যে উদ্যোগ ও পরিষেবাক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। পরিষেবাক্ষেত্রের প্রয়োগের লাভ পেতে ৫ বছর সময় পর্যাপ্ত, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তা অনেকটাই কম। তার সঙ্গে, পিএলআই যোজনার সাফল্যকে অ্যাসেম্বলি লাইন হওয়ার বিষয় না দেখে ভারতীয় কম্পানিগুলির গবেষণা ও উন্নতির মাদ্যমে স্বদেশি দ্রব্য নির্মাণ করে তাকে দেশে ও বিদেশে বিক্রি করে। বর্তমানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ধমকি দিচ্ছেন যে, অ্যাপল আমেরিকাতে নিজস্ব ফোন তৈরি করুক। অ্যাপল যদিও ভারতে কিছু লোককে রোজগার দিচ্ছে, কিন্তু ভারত তা থেকে প্রত্যক্ষ আর্থিক লাভ পাচ্ছে না। মাত্র ২ শতাংশই ভারত পাচ্ছে, যা অন্য দিক দিয়ে পিএলআই রূপে ঘুরে অ্যাপল ও আমেরিকার কাছেই চলে যাচ্ছে। ভারতের বাজার, দক্ষ শ্রমবল, প্রযুক্তিগত ক্ষমতা এবং ভৌগোলিক স্থিতি গুরুত্বপূর্ণ লাভ প্রদান করে।

বড়ো লক্ষ্যের দিকে

ভারতের লক্ষ্য ২০৩০ পর্যন্ত ১০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থব্যবস্থা নির্মাণ, যার জন্য ৮-৯ শতাংশ নিয়মিত জিডিপি বৃদ্ধি প্রয়োজন। এই লক্ষ্য পূর্তি সমস্ত ক্ষেত্রে গঠনমূলক পরিবর্তন, পরিকাঠামোর বিকাশ, মানব পুঁজি বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিতে নবায়নযোগ্য সফল উপযোগিতার উপর নির্ভর করছে। পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে আশা রয়েছে কিন্তু 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি জরুরি যাতে জিডিপিতে এর অংশগ্রহণ ২৫ শতাংশ হয়। নবীকরণীয় বিদ্যুৎ শক্তি, জৈব প্রযুক্তি, মহাকাশ প্রযুক্তি এবং উন্নত শিল্পের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিকে এতে খুব বেশি করে অংশগ্রহণ করতে হবে। আইএমএফ অনুসারে ভারত ৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থব্যবস্থার সঙ্গে ২০২৮ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে বড়ো অর্থব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই কারণে বিশ্বে একটা মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব পড়বে যা ভারতকে বিশ্বস্তরে কূটনৈতিক অগ্রগতি প্রদান করবে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার প্রভাবসম্পন্ন হবে।

(লেখক দিল্লির শহিদ ভগৎ সিংহ কলেজের সহ অধ্যাপক)

তিনবিঘা থেকে শিলিগুড়ি করিডোর সীমান্তে নতুন আগুন, নিরাপত্তায় শৈথিল্য

সাধন কুমার পাল

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের উসকানিমূলক মন্তব্যের পর চিকেনস্ নেক অঞ্চলটি নতুন করে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। ইউনুস ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে (সেভেন সিস্টার্স) 'স্থলবেষ্টিত' বলে উল্লেখ করে বাংলাদেশকে এই অঞ্চলে 'সমুদ্রপথে প্রবেশের নিরিখে অভিভাবক' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

ভারতের আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হলো, অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিলিগুড়ি করিডোরের কাছে লালমনিরহাটে ব্রিটিশ আমলের বিমানঘাঁটি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য চীনা বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে লালমনিরহাট বিমানঘাঁটির কাজ ২০২৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে শুরু হতে পারে, যেখানে একটি পাকিস্তানি কোম্পানি উপ-ঠিকাদার হিসেবে থাকবে। ভারত-ভুটান-চীন ত্রি-জংশনের কাছে চীনের সম্প্রসারিত সামরিক পরিকাঠামো এই অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে। ২০১৭ সালের ডোকলাম অচলাবস্থা ভারতকে এই করিডোরের সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে বাধ্য করে। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এই করিডোরের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি তেল ও গ্যাস পাইপলাইন, বিদ্যুৎ গ্রিড এবং একটি একক রেলপথ এখনো কৌশলগত একটি উদ্বেগের বিষয়। কারণ এটি শত্রুপক্ষের লক্ষ্য হতে পারে। এই করিডোরটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই ট্রানজিট ও বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন দশ লক্ষ যানবাহন—ট্রাক, বাস, এসইউভি, ব্যক্তিগত গাড়ি এই করিডোর ব্যবহার করে, যা ২,৪০০ মেট্রিকটন পণ্য পরিবহণ এবং ১৪২ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ে সহায়ক।

চিকেনস্ নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং গড়ে ২২ কিলোমিটার প্রশস্ত অঞ্চল যা ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আটটি রাজ্য— অরুণাচল প্রদেশ অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা-কে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

> **"পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তার শিথিলতা সমগ্র দেশের নিরাপত্তার জন্যই অশনিসংকেত। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কারণে বছরের পর বছর ধরে শিলিগুড়ি করিডোরের জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে এবং ভারতের শত্রুরা ওই অনুপ্রবেশকারীদের ব্যবহার করে এলাকায় সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে।"**

পশ্চিমাঞ্চলে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার পর ভারতীয় কূটনৈতিক এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য উত্তরবঙ্গ এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র সংযোগকারী অঞ্চল চিকেনস্ নেকের স্পর্শকাতরতা আবার একবার ভাবনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। শিলিগুড়ি করিডোরটি অসামরিক চলাচল এবং সামরিক সরবরাহ উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। চিকেনস্ নেকের দৈর্ঘ্যের এক প্রান্তে বিহারের কিষাণগঞ্জ এবং অন্য প্রান্তে শিলিগুড়ি অবস্থিত। এর সংকীর্ণতম স্থানের প্রস্থ ১৩ কিলোমিটার এবং প্রশস্ততম স্থানের প্রস্থ ২৩ কিলোমিটার।

এই রুটে যেকোনো বিঘ্ন ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য সরাসরি হুমকি স্বরূপ। নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত এই চিকেনস্ নেক অঞ্চলটি ভুটান ও চীনের খুবই কাছে অবস্থিত। এই জন্যই এর নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। চিকেনস্ নেকের নিরাপত্তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই ভূখণ্ডেই সম্প্রতি 'অপারেশন তিস্তা প্রহার' হয়ে গেল।

অপারেশন সিঁদুর শুরুর পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীদের ভার্চুয়াল বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকের পর মিডিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা গেছে, পুলিশকে বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের সূত্রও বলছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ 'আমাদের সীমান্তে নজর রাখতে হবে, যাতে কেউ অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে,

ফঃ ২

ট্রেন স্টেশনগুলিকেও নজরদারিতে রাখতে হবে’।

রাজ্য সরকার জমি দেয়নি বলে এতদিন সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার থানারগুলির পরিকাঠামোর দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আইনশৃঙ্খলা সামলে সীমান্তে বাড়তি নজর দেওয়া কার্যত অসম্ভব।

কোচবিহার : মোট সীমান্ত ৫০০ কিলোমিটার, অসুরক্ষিত সীমান্ত ৫০ কিলোমিটার। সীমান্ত এলাকায় কোনো কোনো থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী : সিতাই ২৫, কুচলিবাড়ি ৩১, মেখলিগঞ্জ ২০, সাহেবগঞ্জ ৩০, দিনহাটা ৩৮, হলদিবাড়ি ২২, মাথাভাঙ্গা ১৬ + (কনস্টেবল কত, জানায়নি থানা), তুফানগঞ্জ ৩১, চর বালাভূত ফাঁড়ি ৪, নয়ারহাট ফাঁড়ি ১৪, শীতলকুচি ২১।

জলপাইগুড়ি : মোট সীমান্ত ৯৪ কিলোমিটার, অসুরক্ষিত সীমান্ত ১৯ কিলোমিটার, সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী, রাজগঞ্জ থানা ৩২, মানিকগঞ্জ ১৩, নিউ জলপাইগুড়ি ৫৮। দার্জিলিং, মোট সীমান্ত ২১ কিলোমিটার, অসুরক্ষিত সীমান্ত ৪,৫-৫ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী— ফাঁসিদেওয়া থানা ৩৫।

উত্তর দিনাজপুর : মোট সীমান্ত প্রায় ২২৭ কিলোমিটার, অসুরক্ষিত সীমান্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার, সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী : কালিয়াগঞ্জ ৬৪, হেমতাবাদ তথ্য মেলেনি, ভাটোল ফাঁড় ১৫, করণদিঘি ১৯, রসাখোয়া ফাঁড়ি ৪, গোয়ালপোখর থানা ৩০, চোপড়া থানার তথ্য মেলেনি। ইসলামপুর থানা, রামগঞ্জ ফাঁড়ি ৩৫, পাটাগড়া ফাঁড়ি ৩২ জন।

দক্ষিণ দিনাজপুর : মোট সীমান্ত ২৫২ কিলোমিটার, অসুরক্ষিত সীমান্ত, ৩০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী। বালুরঘাট ৫৯, হিলি ২২, পতিরাম ২৩, কুমারগঞ্জ ২৬, তপন ২৯, গঙ্গারামপুর ৪৬, কুশমণ্ডি থানা ৩৩। **মালদহ :** মোট সীমান্ত ১৭২ কিলোমিটার, অসুরক্ষিত সীমান্ত ৩২ কিলোমিটার। সীমান্ত এলাকায় কোন কোন থানা এবং ফাঁড়িতে কত পুলিশকর্মী বৈষ্ণবনগর থানা ২০, বামনগোলা ৮, হবিবপুর ১৩, ইংরেজবাজার ২৭, মালদা ১৯, (সব জায়গাতেই টহলদারি ভ্যান আছে)

শিলিগুড়ি করিডরের লাগোয়া অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব উদ্বেগের বিষয়। :এই অঞ্চলের ৯৯ শতাংশ সীমানা পাঁচটি প্রতিবেশী দেশ--- চীন, মায়ানমার, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে যুক্ত। স্বাভাবিক ভাবেই করিডোরের মধ্য দিয়ে স্থলসীমার বাকি ১ শতাংশ অঞ্চলের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পথের উপর যে কোনো আক্রমণ বা অবরোধের ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের দিনাজপুরের রংপুর বিভাগে চীনা শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি উদ্বেগজনক ঘটনা। এই পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি কৌশলগত বা সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে, যা শিলিগুড়ি করিডোরের অস্বস্তিকরভাবে কাছাকাছি। পূর্ব নেপালে, বিশেষ করে করিডোরের কাছাকাছি প্রকল্পগুলিতে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিষয়টি ভারত ও নেপালের মধ্যে উন্মুক্ত সীমান্তের কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জে তিনবিঘা করিডোর (১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার) সমগ্র দেশের নিরাপত্তার জন্য শিলিগুড়ি করিডরের মতোই আরেকটি বিপজ্জনক এলাকা। এই করিডোর দিয়ে বাংলাদেশের মূলভূখণ্ড থেকে ভারতের ভিতরে থাকা বাংলাদেশের ছিটমহল আঙ্গারপোতা ও দহগ্রামে ওই দেশের বাসিন্দারা অবাধে যাতায়াত করে। আঙ্গারপোতা ও দহগ্রামের চারদিকে কোনোরকম বেড়া নেই। এই ছিটমহলগুলি থেকে মেখলিগঞ্জ পুরএলাকা পায়ে হেঁটে বড়োজোর মিনিট দশেকের পথ হবে। এই পথে অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিদিনের ঘটনা। তিনবিঘা করিডর চালু হওয়ার পর থেকে নিরন্তর এই অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে। শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা নিয়ে যতটা সাজোসাজো রব রয়েছে তিনবিঘা করিডর নিয়ে সরকার ততটাই নীরব। বাংলাদেশে শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের পর অনুপ্রবেশ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অভিযোগ, সীমান্তে সক্রিয় চোরাকারবারী ও দেশ বিরোধীদের অবৈধ কারবার রাজ্যে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস।

সেজন্য বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি ভাষায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মতো বিএসএফ-কে গালমন্দ করা, সেই সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষায় রাজ্য সরকারের দায় অস্বীকার করা মুখ্যমন্ত্রী মমতা এবং তাঁর দলের নেতা-মন্ত্রীদের প্রতিদিনের রাজনৈতিক কর্মসূচির অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তার শিথিলতা সমগ্র দেশের নিরাপত্তার জন্যই অশনিসংকেত। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কারণে বছরের পর বছর ধরে শিলিগুড়ি করিডোরের জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে এবং ভারতের শত্রুরা ওই অনুপ্রবেশকারীদের ব্যবহার করে এলাকায় সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে। সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে থাকলেও শিলিগুড়ি করিডোর, তিনবিঘা করিডোর বা সীমান্ত এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। সেজন্য সীমান্ত সুরক্ষার কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের মধ্যে যথার্থ সমন্বয় সেইসঙ্গে প্রয়োজন জনসচেতনতা। সমস্ত দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবে সীমান্ত এলাকার থানাগুলিকে ঢেলে সাজাতে হবে। কেন্দ্র সরকারকে আরও কঠোর হতে হবে।

রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমান এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে এবং এরা আইন শৃঙ্খলার অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে আধার, প্যান, পাসপোর্ট ও রেশন কার্ড তৈরি করে ভোটার তালিকায় নাম তুলে নাগরিকত্বের সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে, যা দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও চিন্তাজনক।

মহেশতলার ঘটনা জেহাদি সন্ত্রাসের স্ফুলিঙ্গ মাত্র

আনন্দ মোহন দাস

গত ১১ মে কলকাতা শহরের কাছাকাছি মহেশতলায় জেহাদিদের দ্বারা হিন্দুদের তুলসীমঞ্চ ভাঙার ঘটনা, হিন্দুর সম্পত্তি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ১৯৪৬ সালের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের বেদনাদায়ক স্মৃতিকে উসকে দেয়।

তুলসীগাছরূপী দেবীকে হিন্দুরা পূজা করেন, তুলসীতলায় সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেন। এটি হলো হিন্দু সংস্কৃতি ও পরম্পরার অঙ্গ। তুলসী ছাড়া নারায়ণ সেবা হয় না। প্রায় সব পূজাই তুলসী ছাড়া অসম্পূর্ণ, সেজন্য তুলসীগাছ হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও শ্রদ্ধার বস্তু। হিন্দুরা দেবীরূপে তুলসীকে পূজা করে এবং সম্মান করে। সেই তুলসীমঞ্চ ভাঙার বর্বরোচিত ঘটনা হিন্দুরা কখনো মেনে নিতে পারেন না।

হিন্দুদের কাছে ধর্মরক্ষার লড়াই। ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। তুলসীমঞ্চে আঘাত মানে হিন্দু অস্মিতায় আঘাত, হিন্দু ধর্মাচরণে আঘাত। কলকাতার পার্শ্ববর্তী মহেশতলা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিভিন্ন জায়গায় ধারাবাহিকভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্তের একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র।

আকস্মিক ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুরা অসুরক্ষিত অনুভব করছেন এবং আতঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। জেহাদি শক্তি দ্বারা ধর্মীয় আচার আচরণে বাধা সৃষ্টিতে স্থানীয় হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাহলে কি বাংলাদেশের পথে পশ্চিমবঙ্গ হাঁটছে?

মহেশতলায় পুলিশ অসহায়ভাবে মার খেয়েছেন এবং প্রায় ১৫ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। সুতরাং নিরস্ত্র শান্তিপ্রিয় হিন্দুসমাজ জেহাদি গোষ্ঠীর কাছে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানবিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী সেকু-মাকুরা এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ না করে চুপ করে রয়েছেন। যাঁরা একই বৃন্তে দুটি কুসুমের ওকালতি করেন, সেই সমস্ত রাজনৈতিক

দলগুলিও এই ব্যাপারে কোনোরকম প্রতিবাদ করার সাহস দেখাননি। ভোট বড়ো বালাই। সাম্প্রতিক কালে কলকাতার পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, তিলজলা, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ-সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে যেভাবে জেহাদি শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে অশনি সংকেত হিসেবে দেখা দিয়েছে।

সম্প্রতি কলকাতায় এনআইএ-র জালে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং কয়েকটি জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য ধরা পড়েছে, তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত চিন্তাজনক। বিশেষ করে রাজধানী কলকাতা এখন নিরাপদ কিনা বলা খুব মুশকিল। নাক উঁচু বাঙ্গালি এখন ভাতাসর্বস্ব হয়ে নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদাসীন। দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এখন জেহাদি ও জঙ্গি কার্যকলাপের নিরাপদ স্থল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সম্প্রতি অন্য রাজ্যে গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগ পাওয়া গেছে। জঙ্গিরা রাজ্যকে গোপন করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে বলে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি মনে করছে।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এখন জেহাদিদের হাতে চলে গেছে। মুর্শিদাবাদ, মালদার মোথাবাড়ি, কলকাতার মহেশতলার ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। জেহাদিদের আক্রমণে পুলিশ কর্মীরা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মহেশতলার ডিসিপি (পোর্ট) হরিকৃষ্ণ পাল-সহ বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী জেহাদিদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন এবং আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এমনকী এখানে একসময় পুলিশকে মার খেয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হতে হয়েছে। পুলিশের মনোবল এখন তলানিতে ঠেকেছে। কারণ চাকরি বাঁচাতে শাসক দলের পদলেহনে অধিকাংশ পুলিশ ব্যস্ত থাকেন। তারা শাসকদলের চাপে বেআইনি কাজের সঙ্গেও আপোশ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিরোধী দলের রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করে শাসকের কৃপাধন্য থাকার চেষ্টা করছেন।

পুলিশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ায় দক্ষ পুলিশ অফিসাররা প্রশাসনিক কাজে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। শাসক দলের নেতারা থানার আইসি-র স্ত্রী ও মাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও হুমকি দিলেও কোনো শাস্তি হয় না। শাসক দলের চাপে পুলিশ আজ অসহায় হয়ে নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন। তাই দুধেল গাইয়েরা আইন শৃঙ্খলা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে উদ্দেশ্যসাধ্যনে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চক্রান্ত করে চলেছে। এরাই মালদায় পুলিশের উপর গুলি চালাতেও দ্বিধা করেনি। হিন্দুর সম্পত্তি ধ্বংস করে ভিটেমাটি ছাড়া করার পরিকল্পনা রয়েছে। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার নামে মুর্শিদাবাদে পরিকল্পিত আক্রমণ করে হিন্দুবাড়ি চিহ্নিত করে সন্ত্রাস এবং হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের হত্যা গ্রামগুলিকে হিন্দুশূন্য করার বড়ো চক্রান্ত।

পশ্চিমবঙ্গে তোষামোদি ও ভোটব্যাংকের রাজনীতির কুফল সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যার ফলে শাসকদল দেখেও না দেখার ভান করছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মহেশতলা-সহ বিভিন্ন স্থানে বেছে বেছে হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও আক্রমণ নেমে এসেছে, তাতে হিন্দুরা আতঙ্কিত। রাজ্যে বিগত কয়েকটি ঘটনার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এরা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী হিন্দু সংস্কৃতি, পরম্পরা, নারী সম্মান এবং মঠ-মন্দির-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত হানছে। হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। হিন্দুদের জীবন বিপন্ন হওয়ার পথে। বরং হিন্দুসমাজ এইসব ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামলে উলটে তাদের জুটছে লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তারি ও কেস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করাও হয় না।

এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে গুন্ডারাজ প্রতিষ্ঠা করে এলাকাকে অশান্ত করে তুলেছে। শেখ শাজাহানের মতো বহু নেতাই আজ প্রশাসন ও পুলিশকে পাত্তা না দিয়ে নিজেদের দাপট বজায় রেখে অপরাধের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। এরা আইন আদালতকেও বুড়ো আঙুল দেখানোর সাহস রাখে। রাজ্যে প্রায়ই কোথাও না কোথাও বোমা, গুলি, বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করার ঘটনা ঘটছে। কোথাও কোথাও বোমা বিস্ফোরণে লোক মারা যাচ্ছে। দুধেল গাইয়েরা লাগামছাড়া প্রশাসনের সুযোগে কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে হিংসাত্মক ও অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। আমাদের সামনে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে।

রাজ্যে রোহিঙ্গা মুসলমান এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে এবং এরাও আইন শৃঙ্খলার অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে আধার, প্যান, পাসপোর্ট ও রেশন কার্ড তৈরি করে ভোটার তালিকায় নাম তুলে নাগরিকত্বের সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে, যা দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও চিন্তাজনক। জেহাদিদের বাড়বাড়ন্ত আমরা সিএএ, এনআরসি, ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনেও লক্ষ্য করেছি। এর জন্য শাসক দলের মন্ত্রী নেতাদের একাংশ বিশেষভাবে দায়ী।

সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, শাসক দলের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদিকুল্লা চৌধুরী জামায়াতে ইসলামির সভায় বলেছেন, কয়েক ঘণ্টায় কলকাতাকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন। শাসক দলের আরেক মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, ইসলামের অনুগামী ছাড়া সবাই পাপী। সবাইকে দাওয়াত দিয়ে ইসলামে নিয়ে আসতে হবে। আগামীদিনে ইসলামই পথ দেখাবে এবং উর্দুই বাংলার মূল ভাষা হবে। এই মন্ত্রীই একবার পাকিস্তানের এক সাংবাদিককে খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলকে দেখিয়ে মিনি পাকিস্তান বলে দাবি করেছিলেন। মন্ত্রী এই ধরনের বিদ্বেষমূলক প্রচারে লিপ্ত থাকলেও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এছাড়াও শাসক দলের মুর্শিদাবাদের এমএলএ হুমায়ুন কবির আমরা ৭০ আর ওরা ৩০ শতাংশ উদাহরণ দিয়ে হিন্দুদের ভাগীরথীর জলে কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। বিভিন্ন জায়গায় লাভ জেহাদ ও ল্যান্ড জেহাদ বেড়েছে। তাই এই সমস্ত নেতা মন্ত্রীদের ছোটো বড়ো চেলারা উৎসাহ সহকারে বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আগামী দিনে ভয়াবহ পরিণতির দিকে রাজ্য এগিয়ে চলেছে। সরকার অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামীতে অবাঞ্ছিত ঘটনা বৃদ্ধি পাবে।

তাই হিন্দুসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেহাদিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। নাহলে পশ্চিমবঙ্গ আরেকটি বাংলাদেশ রূপান্তরিত হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে। তবে আতঙ্কিত হওয়া সমাধানের পথ নয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অনন্য প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানের কবল থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করেছিলেন, তার সমাপ্তি কোনোমতেই হতে দেওয়া যাবে না। এই মুহূর্তে সেই সাহসী মহান উদ্ধারকর্তা গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথা মনের মধ্যে ভেসে উঠাই স্বাভাবিক। পশ্চিবঙ্গে হিন্দু অস্তিত্ব বজায় রাখতে সেই মহাপুরুষদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

□

মোদীজীর এগারো বনাম দিদির চোদ্দো

পিনাকপাণি ঘোষ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকাল মনে করলেই কয়েকটি বড়ো সাফল্যের কথা মনে পড়ে। অযোধ্যায় ভগবান রামলালার ভব্যমন্দির নির্মাণ থেকে পাকিস্তানি হামলার যোগ্য জবাব, কিংবা সফল চন্দ্রাভিযান থেকে তিন তালাক নিষিদ্ধ করা বা ৩৭০ ধারা বিলোপের কথা আলোচনায় আসে। কিন্তু এই ১১টা বছর ভারতকে এমন ছোটো ছোটো অনেক কিছু দিয়েছে যা আসলে অনেক বড়ো। এই সময়ে ভারতের সব সাবালক নাগরিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়েছে। জন ধন যোজনার মাধ্যমে দেশের ৫৫ কোটি মানুষ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পেরেছেন, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের একটি বড়ো অংশ প্রথমবার ব্যাংকিং সুবিধা পেয়েছে, যা তাদের আর্থিক সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করেছে।

কোনো ছুটি ছাড়া ২৪ ঘণ্টার ডিজিটাল ব্যাংকিং জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে গোটা দেশে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুদ্রা ঋণ প্রকল্প দেশের ছোটো ব্যবসায়ীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৫২ কোটি ঋণ দেওয়া হয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। মুদ্রা ঋণের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সহজেই ব্যবসা করার সুযোগ পেয়েছেন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেটের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে রেল বাজেট। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় রেল। এই সময়কালেই জিএসটি-র মতো পরোক্ষ কর সংস্কার বা যোজনা কমিশনের পরিবর্তে নীতি আয়োগ গঠনের মতো কাজও সম্পন্ন হয়েছে। 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর মতো সরকারি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প দেশজুড়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। সফল চন্দ্রাভিযান করেছে ভারত। সবক'টি পদক্ষেপই যুগান্তকারী।

আবার এই সময়কালেই করোনাকাল এসেছে। দেশের ভিতরে তো বটেই, গোটা বিশ্বে ভারতের তৈরি টিকা সমাদৃত হয়েছে। এমন তালিকা লম্বা করে ফেলা যায়। বর্তমানে ১৫ কোটি পরিবার তাদের বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পেয়েছে, যা রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার সমান। এই প্রকল্পটি দেশের গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলপ্রবাহকে নিশ্চিত করেছে এবং এর ফলে কোটি কোটি মানুষ সুস্থ জীবনযাপন করছে। প্রায় ২৫ কোটি কৃষককে স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হয়েছে, যা ব্রাজিলের জনসংখ্যার থেকেও বেশি। এই কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের জমির মাটি কেমন রয়েছে, তা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে উন্নত চাষাবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার প্রতি মাসে ৮১ কোটি মানুষের জন্য বিনামূল্যে রেশন বিতরণ করছে, যা আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার মোট জনসংখ্যার সমান। ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম স্মার্টফোন নির্মাতা দেশগুলির মধ্যে একটি করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে শুরু হওয়া 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখন প্রতি সপ্তাহে ৬৩ লক্ষ স্মার্টফোন তৈরি হচ্ছে ভারতে।

ঠিক একইভাবে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে রাজ্য সরকার, তার বয়সও ১৪ বছর হয়ে গেল। কেউ যদি

দিদিকালের ইতিহাস কালো অক্ষরে লেখা হবে সন্দেশখালির ঘটনা। তৃণমূলের আমলে এসএসসি ও প্রাইমারি স্কুলের চাকরিতে সবথেকে বড়ো দুর্নীতি। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে স্পষ্ট যে ২০১৬-র এসএসসি-তে ২৬ হাজার চাকরি চুরি হয়েছে। সবথেকে বেশি ব্রেন ড্রেন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এখন বাংলাভাষা নিয়ে কাজ করতেও নয়ডা, গুরুগ্রাম, এমনকী দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যে যেতে হয় রাজ্যের মেধাবীদের। দুর্নীতিতে পশ্চিমবঙ্গ এক নম্বরে। তৃণমূল আর দুর্নীতি সমার্থক।

মোদী সরকারের আমলে ১৫ কোটি পরিবার তাদের বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পেয়েছে। প্রায় ২৫ কোটি কৃষককে স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হয়েছে, প্রতি মাসে ৮১ কোটি মানুষের জন্য বিনামূল্যে রেশন বিতরণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে শুরু হওয়া 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পে রপ্তানি বেড়েছে নজরকাড়া। প্রতি সপ্তাহে ৬৩ লক্ষ স্মার্টফোন তৈরি হচ্ছে ভারতে। কেন্দ্রীয় সরকার শেষ ১১ বছরে দেশের আর্থিক অবস্থাকে মজবুত করেছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি।

এই সময়টাকে ১৪ বছরের বনবাস বলেন তাতে এই প্রতিবেদকের আপত্তি রয়েছে। বনবাসেও রঘুপতি শ্রীরাম যা যা করেছেন, তা ইতিহাস হয়ে রয়েছে। দিদির ১৪ বছরেও অনেক ইতিহাস তৈরি হয়েছে, কিন্তু তাকে বনবাস বললে রামায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হয়ে যাবে। মমতাদিদির প্রতিও। আমি বরং, এই সময়কালকে 'দিদিকাল' বলতেই ভালোবাসি।

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এলেন ২০১১ সালে। প্রায় সাড়ে তিন দশকের বাম শাসনের অবসান হলো। রাজ্যের মানুষ সেই পরিবর্তনের দিকে অনেক দিন ধরেই তাকিয়ে ছিল। দিদি যেদিন শপথ নিলেন, সেদিন উৎসবের মেজাজ ছিল এই রাজ্যে। তাঁর মুখে 'বদলা নয় বদল চাই' স্লোগান সবার কানে মধু ঢেলে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরে রাজ্য জুড়ে বদলার রাজনীতি কেমন চেহারা নিয়েছে তা সব রাজ্যবাসী ভালোই জানে। তারপরে এক দিন দিদির মুখে নতুন স্লোগান— 'যে গোরু দুধ দেয়...'। দিদির ক্ষমতায় আসার দু'বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। ২০১৩ সালে প্রথমে সারদা কোম্পানি, পরে রোজভ্যালি-সহ একের পর এক চিটফান্ড দুর্নীতি সামনে এল। একের পর এক ধর্ষণ, বীরভূম থেকে অনুব্রতর হুংকার, খাগড়াগড় বিস্ফোরণ, শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ। অনেক ভয়ংকর ঘটনা এই রাজ্যে গত ১৪ বছরে ঘটেছে। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের চটুল কথাবার্তা রাজ্যবাসীকে শুনতে হয়েছে। রাজ্যের কোণে কোণে তৈরি হয়েছে একাধিক শেখ শাজাহান। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে চলেছে গোরু-বালি- কয়লা পাচার। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন পাশের পর দুধেল গাইদের দৌরাত্ম্যে হাওড়া থেকে মুর্শিদাবাদ জ্বলেছে।

তারপর হলো পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবীর ফ্ল্যাটে রাশি রাশি টাকা উদ্ধার। কোটি কোটি টাকার সঙ্গে মিলল সোনার গয়না, বিদেশি মুদ্রা। দিদির দলের মহাসচিব, রাজ্যের মন্ত্রী এই বিপুল পরিমাণ টাকা তুললেন, কিন্তু কিছুই জানতেন না মুখ্যমন্ত্রী। পার্থকে দল থেকে বহিষ্কার করে হাত ধুয়ে নিলেন। এরপর আরজি কর কাণ্ড। নতুন করে সেই সব দুঃখের কাহিনি বলতে চাই না। গোটা রাজ্য রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেই প্রতিবাদে তৃণমূল কর্মী, সমর্থকদের পরিবারের মা, বোনেরাও ছিলেন। প্রতিবাদী পদযাত্রা থেকে সাধারণ মানুষকে চিৎকার করে বলতে শোনা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারি চাই। তার ইস্তফা চাই। কিন্তু 'চাই' বললেই কি পাওয়া যায় নাকি? সবকিছু তো মামাবাড়ির মোয়া নয়। পিসির বাড়িরও নয়। এই তো সেদিন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়ে গেল। সে গেল তো গেল! তাতে কী হলো? এই দিদিকালেই তো পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যাচ্ছে, ক্লাবে ক্লাবে দুর্গার ভাণ্ডার! জয় বাংলা!

এসব বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১১ বছরে যে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি তা বলা ভুল হবে। তুলনা টানা হলে এটা তো মেনে নিতে হয় যে, এ রাজ্যে দুর্নীতি হওয়ারই কথা ছিল। তৃণমূল আর দুর্নীতি সমার্থক। বরং, এটা বলা দরকার যে, এই রাজ্যের মানুষ দিদিকালে অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের মতো মোদীজীর সময়কালের অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে চালু হওয়া আয়ুষ্মান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৯০ কোটি মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পেয়েছেন। এই সংখ্যা কানাডার জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি। আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, যেখানে দেশের দরিদ্র এবং গ্রামীণ জনগণের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া সহজতর হয়েছে। না, পশ্চিমবঙ্গের মুকুটে নতুন পালকও লেগেছে। এই সময়কালে দেশের প্রথম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে নদীর তলা দিয়ে চলছে মেট্রো রেল।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায়শই শোনা যায়, কেন্দ্র বঞ্চনা করছে। বাম আমলের ভাঙা রেকর্ড। তৃণমূল জমানাতেও বলা হয়ে থাকে যে, পশ্চিমবঙ্গকে তার প্রাপ্য থেকে নাকি বঞ্চিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে। যদিও এখন আইনত সেই সুযোগই নেই। জিএসটি বাবদ আয়ের একটা অংশ রাজ্যে ফেরত আসে। মনমোহন সিংহ সরকারের আমলে রাজ্যকে ১.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল ১০ বছরে। আর নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১১ বছরে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে ৫.২৪ লক্ষ কোটি টাকা। চার গুণ বেশি। ইউপিএ আমলে এই রাজ্য গ্র্যান্ট-ইন-এইড পেয়েছিল ৭৫ হাজার কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদীর সময়ে পশ্চিমবঙ্গ গ্র্যান্ট-ইন-এইড পেয়েছে ৩ লক্ষ কোটি টাকা।

দিদিকালে পশ্চিমবঙ্গ কি এগোয়নি? কে বলেছে 'না'! কোনো এমন ছ'মাস যায় না যে, রাজ্যের কোথাও কোনো মহিলার উপর অত্যাচারের ঘটনা সামনে আসে না। যদি দিদিকালের ইতিহাস লেখা হয় তাহলে, কালো অক্ষরে লেখা হবে সন্দেশখালির ঘটনা। যে পশ্চিমবঙ্গ একদা উন্নতির শিখর ছুঁয়েছিল, সেই রাজ্যে আজ শিক্ষার কথা জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে তৃণমূলের আমলে এসএসসি ও প্রাইমারি স্কুলের চাকরিতে সবথেকে বড়ো দুর্নীতি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে স্পষ্ট যে ২০১৬-র এসএসসি-তে ২৬ হাজার চাকরি চুরি হয়েছে। ক্যাগ রিপোর্টে প্রায় সব খাতের হিসাবেই গরমিল পাওয়া গিয়েছে। এই পরিমাণ টাকা কোথায় গেল? কারা লুটল? পশ্চিমবঙ্গে এখন সে প্রশ্ন করতেও সাহস লাগে। সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণও তো দিদিকালের একটা প্রশাসনিক সাফল্য।

হিসাব করলে দেখা যাবে দিদিকালে সবথেকে বেশি ব্রেন ড্রেন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এখন বাংলাভাষা নিয়ে কাজ করতেও নয়ডা, গুরুগ্রাম, এমনকী দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যে যেতে হয় এই রাজ্যের মেধাবীদের। তৃণমূলের মাফিয়ারাজ, রাজ্য সরকারের জমি নীতি এবং অ্যান্টি-বিজনেস মানসিকতা রাজ্যের শিল্প ভবিষ্যতের সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে শেষ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার শেষ ১১ বছরে দেশের আর্থিক অবস্থাকে মজবুত করেছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যেন দারিদ্র্য থিমের প্যান্ডেল। মোদীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়কালকে বলা হচ্ছে, উন্নয়নশীল ভারত থেকে বিকশিত ভারতের পথে যাত্রা। তাতে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে। এই রাজ্যের বিকাশের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছে মোদীজীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। সেই রোডম্যাপকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু সেটা করতে চাইলে রেল বা বিএসএফ-কে জমি দিয়ে দিলে, সংকীর্ণ রাজনীতি কে করবে? বাম-তৃণমূল জমানার পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঐতিহ্যই তো নষ্ট হয়ে যাবে! বিজেপি নেতৃত্ব বলেন, এই ১১ বছরে প্রমাণিত হয়েছে যে, 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'। □

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য নতুন বিপদ

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসা, উগ্র জঙ্গি ও মোল্লাবাদী মুসলমানদের উত্থান এশিয়ার শান্তির জন্য গুরুতর উদ্বেগের কারণ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেবল দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং এটি দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য এক গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। রাজনৈতিক সংকট, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্বলতা, জেহাদি শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন— সব মিলিয়ে এই অঞ্চলে এক জটিল অস্থিরতা তৈরি করেছে।

কার্যত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ আশানুরূপ না হওয়ায় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও অনাস্থার পরিবেশ বিরাজমান। নির্বাচন ব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, বিরোধী দলের প্রতি দমনমূলক নীতি এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সংকোচন গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকে দুর্বল করছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব, আস্থার অভাব এবং মতবিনিময়ের অনুপস্থিতি সমস্যা আরও জটিল করে তুলেছে। প্রায়শই দেখা যায়, হিংসা, ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। যজিও সামরিক বাহিনী সরাসরি ক্ষমতায় নেই, তবুও তাদের প্রভাব বা হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা একটি অস্বস্তিকর বাস্তবতা হিসেবে সবসময়েই থেকে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মোল্লাবাদী দল ও গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের অনেকেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরোধিতা করে, যা রাজনৈতিক মেরুকরণ ও সামাজিক বিভাজনকে ত্বরান্বিত করেছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দ্বারা কখনো কখনো মোল্লাবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়, যা জেহাদি চিন্তার বিকাশে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। জাতীয় পার্টির শাসনামলে মহম্মদ এরশাদ সংবিধানে ইসলামকে সরকারি ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে মোল্লাবাদীদের পথ সুগম করেছিলেন। এই সুযোগে ইসলামি দেশগুলিও বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বহির্দেশের পরোক্ষ, নগ্ন হস্তক্ষেপে নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করার ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করেছে। এই সুচিন্তিত

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন দেশের অভ্যন্তরে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং এর প্রভাব দেশের গণ্ডি পেরিয়ে সন্নিহিত অঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। উগ্র জেহাদি মোল্লাবাদীদের প্রতি শেখ হাসিনার নমনীয় মনোভাবের কারণে এই অবস্থা অনেকাংশে দায়ী। তিনি সবাইকে খুশি করতে গিয়ে 'আম ও ছালা' দুটোই হারিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই দেশটির নিজস্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বহির্দেশের নাক গলানোর কথা নয়। কিন্তু অভিযোগ উঠছে, পাকিস্তান নতুন সখ্য তৈরি করে এই অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলাকে মারাত্মকভাবে সমস্যার সম্মুখীন করেছে। পাকিস্তান নাকি গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করে সেগুলি জেহাদিদের হাতে তুলে দিয়ে দেশটিতে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিবির নেতা দস্তুরমতো বিশাল অস্ত্র মজুদের আভাস দিয়ে দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষদের প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন। এই সকল অবৈধ অস্ত্রের উৎস পাকিস্তান বলা হয়ে থাকলেও আমেরিকার নামও সন্দেহের তালিকায় রয়েছে। এছাড়া চীনের থেকেও চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চলে বিশাল অস্ত্রের সমাগম হয়েছে বলে অনেকেই অনুমান করেছেন। সেখানকার জঙ্গিদের হাতে যে সকল অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি অধিকাংশই চীনের তৈরি বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ যখন অস্থিতিশীল হয় তখনই একাত্তরের পরাজিতরা সুযোগ লুফে নেয়। ড. ইউনুসের সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় চীন ও আমেরিকা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা সেন্ট মার্টিন বন্দর দখল ও মানবিক করিডোরের কথা বলে দেশটিকে পঙ্গু করে দিতে তৎপর। মানবিক করিডোর ও বন্দর ভিন্ন দেশের হাতে তুলে দিতে এবং ইউনুসকে ক্ষমতায় রেখে আরও বেশি সুবিধা আদায় করতে তারা কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়েছে। দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ সরকার এই সবকিছু নিশ্চিত করার জন্য ইতিমধ্যে জনগণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের হুমকিও দিয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে বিশাল পরিমাণে বাণিজ্য সম্পন্ন হওয়ায় এই অঞ্চলটি বিশ্বশক্তিগুলোর নজরে অনেক আগে থেকেই ছিল। এবার তারা তাদের কলকাঠি নেড়ে সাগরের পথও উন্মুক্ত করতে চাইছে। এ লক্ষ্যে মার্কিনিরা এরই মধ্যে যৌথ সামরিক মহড়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। সেন্ট মার্টিনে কী হচ্ছে, সে দেশের মানুষ তা জানে না। সেখানে জনসাধারণের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেশটির গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ চুপ, ভয়ে মুখ খুলছে না। এছাড়াও, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোয়াড, চীন-পাকিস্তান জোট বা চীনা অর্থনৈতিক করিডোরের প্রতি অবস্থান স্পষ্ট না হওয়ায় এক ধরনের কৌশলগত দ্বিধা বিরাজ করছে, যা আঞ্চলিক শক্তিগুলোর মধ্যে অনৈতিক প্রতিযোগিতা বাড়াচ্ছে। মানবিক সাহায্যের নামে যে করিডোরের কথা ইউনুস সরকার মরিয়া হয়ে বলছে তাতে তার বদ উদ্দেশ্যেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সেদেশের জনগণের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি একাই স্বাক্ষর লিখে দিয়ে দেশটিকে আবারও পরাধীন করতে উঠে পড়ে লেগেছেন।। তাতে, তার ব্যক্তিগত লাভ প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি দেশের কথা ভাবছেন না। তিনি ব্যস্ত রয়েছেন প্রভুদের খুশি রাখার কাজে।

অন্যদিকে দেশে অভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য ও জ্বালানি সংকট এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি— সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সাধারণের দৈনন্দিন জীবন এখন বিপন্ন। অভিযোগ উঠছে, কিছু শিশু উপদেষ্টাদের অনেকেই এখন হাজার কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। বিদেশে অর্থ পাচার বেড়েছে অতীতের চাইতে অনেক বেশি। মুসলমান রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে নতুন করে আরও পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্র মতে জানা গেছে। দেশে নতুন করে ত্রিশ লক্ষাধিক বেকার সৃষ্টি হয়েছে। পোশাক শিল্প স্থবির হয়ে গেছে। অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নানান হুমকির মুখে ইতিমধ্যে দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এক কথায় বাংলাদেশ এখন দেউলিয়া।

এরই মধ্যে ইসলামের নামে সেখানে নারীশিক্ষা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জামায়াত শিবিরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। স্কুল-কলেজগুলিতে স্বাভাবিক পাঠ বন্ধ। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া বৈদেশিক অস্ত্র যা গত আগস্টে ব্যবহার করা হয়েছিল তার সিকি পরিমাণও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেনাবাহিনীতেও জেহাদিদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে সেনা ছাউনিগুলিও এখন বিপদের সম্মুখীন। নতুন কোনো বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান সেখানে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে না, বরং অনেক বিনিয়োগকারী হাত গুটিয়ে ফেলেছেন।

বাংলাদেশের এই সামগ্রিক পরিস্থিতি এখন দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য এক বিরাট হুমকি। সাম্প্রদায়িক হিংসা, উগ্র জঙ্গি ও মোল্লাবাদী মুসলমানদের এই উত্থান এশিয়ার শান্তির জন্য গুরুতর উদ্বেগের কারণ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এর বাইরে কতিপয় ভেকধারী জেহাদি মোল্লা-মৌলভির মুখে ভারত দখলের যে কথা আমরা নিয়মিত শুনে চলেছি তাতে বাস্তবে অসম্ভব হলেও ভারতের আঞ্চলিক ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। খ্রিস্টানদেশের একজন রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমানদের কাছে এতো প্রিয় হওয়ার পেছনে তাদের ভারত বিরোধিতাই মূল লক্ষ্য। হিন্দুদের উপর প্রতিদিন সেখানকার জঙ্গিরা প্রাণঘাতী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার বলে আসছে তার বিপরীত কথা। আজকে বাংলাদেশে হিন্দুরা আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। হিন্দুরাও থেমে নেই। প্রাণপণে প্রতিরোধও করে চলেছেন তারা। তারা আর দেশ ত্যাগ করতে চাইছেন না। তারা বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে এই জেহাদি শক্তির মোকাবিলা করে চলেছেন। হিন্দুদের এই সংকটজনক সময়ে মানবতাবাদী দেশগুলির হস্তক্ষেপ এখন খুবই প্রাসঙ্গিক। ইউনুস সরকার যে পন্থায় বাংলাদেশকে এক জেহাদি দেশে পরিণত করতে চাইছেন সে গুড়েবালি তো হবেই, বরং তার নোবেল ফিরিয়ে নেওয়ারও আওয়াজ উঠেছে। সম্প্রতি তাঁর লন্ডন সফর একথাই প্রমাণ করেছে। □

ধ্বংসের পথে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা

অজয় ভট্টাচার্য্য

যোগ্য-অযোগ্য বিতর্কের মাঝে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের। উপেক্ষিত হচ্ছে তাঁদের ভবিষ্যৎ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতা কাহিনি'-র মতো পাখির খবর আর কেউ রাখছে না। পঠনপাঠন অপেক্ষা মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কে যোগ্য শিক্ষক আর কে অযোগ্য শিক্ষক, সেই প্রশ্ন। এক সময় শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীরা প্রার্থনা করতেন, 'অসত্য থেকে সত্যের পথে এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে' নিয়ে যেতে। কিন্তু যোগ্য-অযোগ্য বিতর্কের মাঝে মুখ্য প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, কে সেই যোগ্য শিক্ষক যিনি শিক্ষার্থীকে আলোর পথ দেখাবেন! এই প্রশ্নে আজ শিক্ষার্থীরাও দ্বিধান্বিত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার যে জায়গাটা ছিল সেটাই ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে।

এমনিতেই নিয়োগ দুর্নীতির জন্যে বিগত ৯ বছরে সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ থমকে আছে। যার ফলে স্কুলগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে ধুঁকছে। তার উপরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ বাতিল হয়েছে। তাই কাজ চালাবার জন্যে স্কুলগুলিতে অতিথি শিক্ষক রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার জন্যে বেতন বাবদ যে অর্থের প্রয়োজন হয় সেই অর্থ মেটাবার মতো আর্থিক সঙ্গতি স্কুলগুলির থাকে না। আবার সরকারও এ ব্যাপারে হাত-পা গুটিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতা কাহিনি' গল্পে শিক্ষণ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হলেও আয়োজনে কোনো খামতি ছিল না। বরং তা প্রয়োজনের চাইতে অনেকটাই বেশি ছিল। কিন্তু সরকারি স্কুলগুলিতে সেই আয়োজন এতটাই কম যে শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার মতো উপযুক্ত

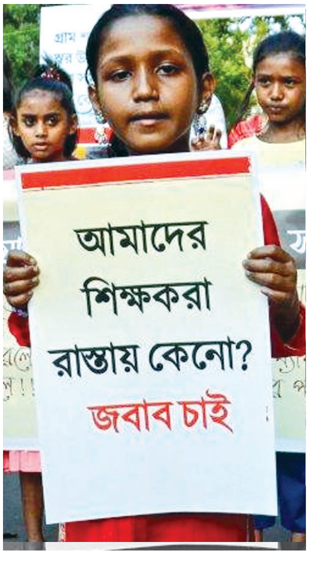

পরিকাঠামো নেই। উলটে সরকারের বদান্যতায় স্কুলের পঠনপাঠন প্রক্রিয়া শিকেয় তুলে ছুটির বহর বেড়ে চলেছে। সরকারি নিয়ম মেনে স্কুলগুলি শিক্ষার্থী-পিছু ২৪০ টাকা বেতন সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু পিছিয়ে পড়া এলাকায় সে টাকাও পাওয়া যায় না। কম্পোজিট গ্রান্ট বাবদ সরকার থেকে যে টাকা স্কুলগুলি পায়, এ বছর তার মাত্র ২৫ শতাংশ টাকা স্কুলগুলির হাতে এসেছে। তাই উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে চাহিদা অনুযায়ী অতিথি শিক্ষক রাখা তো দূরের কথা চক,ডাস্টার কেনার তহবিলেও হাহাকার অবস্থা। সব মিলিয়ে সরকারি স্কুলগুলি পঠনপাঠন আজ ভীষণভাবে উপেক্ষিত। অথচ এই স্কুলগুলির জন্যে বিশেষ করে গরিব ঘরের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজের শীর্ষস্তরে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে মানুষ সরকারি স্কুলগুলির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হবেন তাঁদের ছেলে-মেয়েকে বেসরকারি স্কুলে পড়াতে। সম্ভবত সেই কারণেই সরকার সরাসরি এর দায় এড়িয়ে যেতে পারছে না। কিন্তু বকলমে তাকে অকেজো করে ফেলতেও পিছপা হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে শাসক দলের অতি বড়ো সমর্থকও হয়তো দাবি করতে পারবেন না যে সরকারি স্কুলগুলিকে টিকিয়ে রাখতে সরকারের যথেষ্ট সদিচ্ছা আছে!

প্রত্যক্ষ ভাবে অলাভজনক সংস্থাগুলিকে রাতারাতি লাভজনক সংস্থায় রূপান্তরিত করতে চাওয়ার পরিণাম কী হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ড। খোদ প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ যে, রাজ্যের শাসক দলের বদান্যতায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় লাটে ওঠার পথে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের জন্য শুধু ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রাজ্যের ওবিসি জট এখনো কোর্টের বিচারাধীন। এমতাবস্থায় রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শিকেয় উঠেছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের জন্য স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ। নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের জন্য এসএসসি যে নতুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তাও ত্রুটিপূর্ণ। ফলে আবারও মামলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা এক বিরাট প্রশ্ন। □

ফঃ ৩

দেশের মধ্যে থাকা ঘরশত্রুদের চিহ্নিত করা প্রয়োজন

অমিতকুমার চৌধুরী

ঠিক যা ভাবা তাই হলো। দেশের মধ্যে থাকা সেই ঘরশত্রুরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে তাদের স্বভাবসিদ্ধ মানসিকতায়। এতদিন তারা নিষ্ক্রিয় ছিল, ভাবখানা এমন যে দেশে কিছু হয়নি। হ্যাঁ, সেই ঘরশত্রুরা হলো সেকু-মাকুরা। পহেলগাঁওয়ে বর্বরোচিত হিন্দু হত্যার পর ভারত সরকারের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার পর এই বাম বিশ্বাসঘাতকেরা রাস্তায় নেমে তাদের দেশবিরোধী চরিত্র পুনরায় প্রমাণ করল। যেখানে সমগ্র দেশবাসী প্রতিশোধের জ্বালায় জ্বলছে ও সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে, সেখানে এরা দেশের সরকারের পাশে না দাঁড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে দেশকে, দেশের সরকারকে সংকটাপন্ন করে তুলছে। তারা বর্তমান সরকারকে পছন্দ না করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীজীকে তাদের পছন্দ না হতে পারে কিন্তু সরকার বা মোদীজীর বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশ বিরোধিতায় নেমে পড়ছেন।

যখন পহেলগাঁওয়ে নির্মমভাবে হিন্দুদের হত্যা করা হলো বা আমাদের রাজ্যে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে দুই বাম সমর্থক হিন্দুকে হত্যা করা হলো, হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে, মন্দির আক্রমণ করে গ্রাম ছাড়া করল, যারা স্থানীয় জেহাদিদের আক্রমণে প্রাণভয়ে গঙ্গার ওপার মালদহে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিল, তখন এই সেকু-মাকুরা তাঁদের পাশে না দাঁড়িয়ে নির্লজ্জ নীরবতা পালন করেছে। আর যখন সরকার কড়া হাতে পাকিস্তানের ওই বর্বর জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে তখন গেল গেল রব তুলে বলছে, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। সেই ধরাবাঁধা, ছকেবাঁধা, বস্তাপচা, অভিযোগ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন ভারতের পাশে, সেখানে এই অতিবোদ্ধা বামেরা নোংরা ঘৃণ্য, সংকীর্ণ রাজনীতি করতে নেমে পড়ছে।

এই কমিউনিস্টদের অতীতের ক্রিয়াকলাপ একবার দেখে নেওয়া যাক। এরা সেই কমিউনিস্ট যারা ১৯৪৭ সালে দেশবিরোধী সাম্প্রদায়িক মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশভাগ করে পাপ করেছে। ভারতকে এরা কখনো এক দেশ মনে করেনি। এদের নেতা গঙ্গাধর অধিকারী ভারতকে ১৮টি পৃথক ভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছিল। মুসলিম লিগের চাঁদ-তারা পতাকার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা এক সঙ্গে বেঁধে শহিদ মিনার ময়দানে দাবি তুলেছিল, পাকিস্তান মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে।

স্বাধীনতার পর এদের আবার নতুন নাটক শুরু হলো। ওদের নেতা বিটি রনদিভে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে প্রায় ১৫ বছর ভারতের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছিল। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের সময় এরা চীন নয়, ভারতই প্রথম চীনকে আক্রমণ করেছে বলেছিল। যে জওহরলাল নেহরু কমিউনিস্টদের পছন্দ করতেন, তিনিও কমিউনিস্টদের এই দেশবিরোধী ভূমিকায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী যখন সারা দেশে অন্যায় ভাবে নিজ ব্যাক্তি স্বার্থে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন ও সমস্ত বিরোধী নেতাদের জেলে পুরেছিলেন, সংবাদপত্রের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন, গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করেছিলেন সেই সময়ও সেই স্বৈরাচারী, গণতন্ত্র হত্যাকারী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের বিরোধিতা না করে তাদের সমর্থন করে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সেই সময় এরা মোরারজী দেশাইয়ের জনতা সরকারকে সমর্থন না দিয়ে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরে আসতে সাহায্য করেছিল।

এই সেকু-মাকুরা অভিযোগ করছে আরএসএস-বিজেপি যুদ্ধ জিগির বন্ধ কর, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে ইত্যাদি। এখানে যুদ্ধ জিগিরের প্রশ্ন আসে কী করে? একটি প্রতিবেশী দেশ ৭৮ বছর ধরে অসভ্যতা চালিয়ে যাচ্ছে, দেশের ভেতরে ঢুকে নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে, দেশটাকে জঙ্গি তৈরির কারখানায় পরিণত করেছে, আর তার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিলেই দোষের! ভারত অনেক সংযমের পরিচয় দিয়েছে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। যে যে ভাষায় কথা বলে তাকে সেই ভাষাতেই উত্তর দিতে হয়, যেমন দিচ্ছে ইজরায়েল। এই বামেরা সুদূর প্যালেস্টাইনের জন্য রাস্তায় নামেন অথচ ঘরের পাশে বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনে মৌনব্রত। কী দ্বিচারিতা! তাদের গুরু রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করলে পথে নামে না কেন বামেরা? পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংসে তাদের খুব দুঃখ হচ্ছে! হবেই তো, এই কমিউনিস্ট সমর্থন পেয়েই তো পাকিস্তানের জন্ম। ভারতকে যারা এক অখণ্ড দেখতে চায় না, যারা টুকরে টুকরে গ্যাঙের সমর্থক, যারা পাকিস্তানের স্রষ্টা, তাদের তো দুঃখ হবেই। আসলে কমিউনিস্ট পার্টি জন্মলগ্ন থেকেই জেহাদিদের হাত ধরে চলেছে। আজও চলছে। হাসিনার পতনে ওখানকার অসভ্য, ধর্মান্ধ জেহাদিরা হাসিনার অন্তর্বাস প্রকাশ্যে প্রদর্শন করে, ঠিক কিছু বাম ছাত্ররা কলকাতাতেও প্রকাশ্যে নারীর অন্তর্বাস পড়ে প্রকাশ্য এক বিকৃত মানসিকতা দেখিয়ে আন্দোলন করে।

আজ একশো বছরে পদার্পণ করে কমিউনিস্টদের ভাববার সময় এসেছে তারা তাদের সেই দেশবিরোধী মানসিকতার পরিবর্তন করবেন না আগের মতো থাকবেন? যুগের সঙ্গে তারা অর্থনীতির পরিবর্তন মেনে নিয়েছেন, বিপ্লব ছেড়ে সংসদীয় গণতন্ত্র মেনে নিয়েছেন, কিন্তু ইসলামিক জেহাদিদের নিয়ে আপনাদের মত কি পরিবর্তন করবেন? কমরেড মনে রাখবেন, আপনাদের বেশিরভাগ কমরেড কিন্তু জেহাদিদের তাড়া খেয়ে এই হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গে ভাতের জন্য নয়, জাতের জন্য, ধর্মের জন্য পালিয়ে এসেছেন। আর স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা খুব সেকুলারিজমের বুলি কপচান, কিন্তু বিশ্বে ৫৭টি ইসলামি দেশে একটিতেও সেকুলারিজম নেই ! ভাবুন কমরেড , ভাবা প্র্যাকটিস করুন, নতুবা শূন্য থেকে মাইনাস হয়ে যাবেন। □

অতি আধুনিকতা নারী স্বাধীনতা নয়

নিবেদিতা কর

আধুনিকতা ও অতি আধুনিকতার মধ্যে পার্থক্য কী? আধুনিকতার ঠিক ক'কাঠি উপরে উঠলে অতি আধুনিকা হওয়া যায়? এরকম প্রশ্ন সকলের মনে জাগতে পারে। আবার অনেকের মনে হতে পারে যে শুধুই কি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে অতি আধুনিকতার নাম দেওয়া যায়? আসলে 'আধুনিক' শব্দটি আপেক্ষিক। কয়েকশো বা হাজার বছর আগের অনেক মানুষ তৎকালীন যুগে জন্মেও তাদের যুগের থেকে মানসিকতায় ও ভাবনায় অনেক যুগ এগিয়ে ছিলেন। আধুনিকতা আসলে শুধুই চিন্তনে ও মননে। যদিও বর্তমানে অনেকেই মনে করেন শুধুই ছক ভাঙা বা উচ্ছৃঙ্খল হওয়াই বোধহয় অতি আধুনিকতার লক্ষণ। আসলে কি সত্যিই সকল ক্ষেত্রে ছক ভাঙা অতি আধুনিকতার লক্ষণ? আসুন, একটু আলোচনা করা যাক।

বর্তমানে অনেক বাঙ্গালি হিন্দু নারী মনে করেন বোধ হয় রোজ সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় ধূপ, দীপ জ্বেলে, শঙ্খ বাজিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করা সেকেলে বা ব্যাকডেটেড। আসলে কি তাই? নারীর সৌন্দর্য ধরে রাখার এক কৌশল সনাতন ধর্ম বলে দিয়েছে। নিয়মিত শঙ্খ বাজালে ফুসফুস ভালো থাকে, কারণ শঙ্খ বাজালে ফুসফুসে ঠিকভাবে অক্সিজেন প্রবেশ করে যা একপ্রকার শ্বাসবায়ুর ব্যায়াম এবং অকালে চোয়াল ভাঙে না বা এজিং প্রসেস স্লো হয়। কারণ শঙ্খে ফুঁ দিলে একপ্রকার ফেসিয়াল মাসলগুলোর ব্যায়াম হয়। বর্তমানে অনেক ব্রেনওয়াশ হয়ে যাওয়া মহিলারা মনে করেন সিঁদুর পরা হলো নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং সিঁদুর আসলে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার চিহ্ন। তাই সিঁদুর পরলে কারোর অধীনে থাকা বোঝায়। কিন্তু ইতিহাস অন্য তথ্য দিচ্ছে। ৫ হাজার বছর আগের সরস্বতী সভ্যতা বা সিন্ধু সরস্বতী সভ্যতায় মহিলারা স্বতস্ফূর্ত ভাবে সিঁদুর পরতেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে তৎকালীন কিছু সিঁদুর পরিহিত টেরাকোটার নারীমূর্তিও আবিষ্কার হয়েছে।

বর্তমানে অনেক নারী মনে করছেন, পুরুষদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ধূমপান করলে বোধহয় আধুনিকা হওয়া যায়। তাই বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে স্মল টাউন ও মেট্রো সিটিগুলোয় মহিলাদের ধূমপান করার প্রবণতা বেড়েছে। সম্প্রতি 'টাইমস অব ইন্ডিয়ার' একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে কলকাতায় প্রতি ১০ জন মহিলার মধ্যে একজন মহিলা ধূমপানে আসক্ত। এরকম মহিলারা সত্যি বোকা। আধুনিকা সাজতে গিয়ে অকাল বার্ধক্য ও বন্ধ্যাত্ব ডেকে

আনছে নিজেদের। কলকাতার আইভিএফ ক্লিনিকগুলোতে দিন দিন ভিড় বাড়াচ্ছে।

লাং ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা মেয়েদের সবথেকে বেশি থাকে। কারণ মেয়েদের ফুসফুসের সমস্ত রকম লাং ক্যাপাসিটি ও লাং ভলিউম (উদাহরণ টোটাল লাং ক্যাপাসিটি, টাইডাল ভলিউম) পুরুষদের তুলনায় কম। তাই কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের, পুরুষদের খারাপ দিকগুলোর সঙ্গে বোকার মতো প্রতিযোগিতা না করাই ভালো।

বর্তমানে এক প্রকার হিন্দু বিরোধী, সিউডোসেকুলার, তথাকথিত লিবারেল মানুষরা বাঙ্গালি হিন্দু মহিলাদের মস্তিষ্কে একটি জিনিস বিষের মতো ঢুকিয়েছে। তাহলো পদবি ব্যবহার করা বা গোত্র প্রথার অন্তর্গত হওয়া আসলে নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী বা পিতৃতান্ত্রিক কুপ্রথা। তাই নারীদের পদবিহীন বা গোত্রবিহীন হতে হবে, আর এটাই নাকি আধুনিকা হওয়ার একটি উপায়। আসলে কি সত্যিই হিন্দুদের পদবির ব্যবহার বা গোত্র প্রথা শুধুই নারীকে পুরুষের অধীনে রাখার এক কু প্রথা? তাহলে গোত্র ও পদবি ব্যবহারের পিছনে আসল বিজ্ঞানটি জেনে নেওয়া যাক :

পদবি ব্যবহার করলে গোত্র প্রথা বজায় থাকবে। গোত্র প্রথা হলো বৈজ্ঞানিকভাবে কোনো নির্দিষ্ট জিনপুলকে নির্ধারণ করার এক কৌশল। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী এক একজন আদি ঋষির নাম অনুযায়ী এক একটি গোত্র নির্ধারিত আর সেই গোত্রের অন্তর্গত মানুষরা সেই ঋষির উত্তরপুরুষ। একই পূর্বপুরুষের জিন আছে এমন মানুষদের মধ্যে বিবাহ রুখতে সমগোত্রীয় বিবাহ নিষিদ্ধ। সমগোত্রীয় বিবাহ বৈজ্ঞানিক ভাবে 'স্বগোত্রীয় বিবাহ' নামে পরিচিত যা বিজ্ঞানসম্মত ভাবেও ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ। এইরকম বিবাহের ফলে অপত্যের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়, জেনেটিক ডিসঅর্ডার সম্পর্কিত রোগ আগামী প্রজন্মে বৃদ্ধি পায় যেমন থ্যালাসেমিয়া, ডাউন সিন্ড্রোম, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, ইনফ্যানটাইল সেরিব্রাল পলসি ইত্যাদি, এছাড়াও শিশুর সকল মানসিক ও শারীরিক বিকাশ রোধ হয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয় এমনকী গর্ভপাতজনক সমস্যারও সৃষ্টি করে। তাই অনেক ভেবে চিন্তেই আমাদের প্রাচীন ঋষিরা গোত্র প্রথা শুরু করেছিলেন যাতে যেভাবেই হোক একই জিন পুলের অন্তর্গত মানুষদের মধ্যে বিবাহ রোধ করা যায় ও বৈজ্ঞানিকভাবে মানবকুলকে রক্ষা করা যায়। অনেক নারীর মনে এই প্রশ্নও আছে যে, কেন বাবার গোত্র ও পদবি সন্তানরা পায়? কেন মায়ের নয়? এরও উত্তর দিয়েছে বিজ্ঞান। বাবার দেহ থেকে আসা X বা Y ক্রোমোজোম যেকোনো সন্তানদের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। তাই ক্রমান্বয়ে জিনপুলের হিসেব রাখতে সুবিধে অনুযায়ী বাবার পদবি ও গোত্র শিশুরা পায়।

আধুনিকা থেকে অত্যাধুনিকা হতে হবে ভারতীয় নারীদের। তাই সব কিছু যুক্তি, জ্ঞান, ধৈর্য দিয়ে বুঝে শুনে যাচাই করে নিতে হবে কারোর কথায় মগজ ধোলাই হয়ে নয়। নারীকে নিজের বিবেচনা বোধ দিয়ে কোনোগিছু গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। তবেই তিনি আধুনিকা থেকে অত্যাধুনিকা হবেন। মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষ গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রাদের মতো সর্বকালে পূজিতা মহাজ্ঞানী বিদুষী নারীদের পুণ্যক্ষেত্র। □

গরমে খিদে কমবেই

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

এই গরমে পারদ প্রবল উর্ধ্বমুখী। গরম যে আরও বাড়বে, বলার অপেক্ষা রাখে না। শিশুদের জন্য এমন আবহাওয়ায় মানিয়ে নেওয়া বড়ো কঠিন হয়ে উঠেছে। এই সময়ের একটা প্রধান সমস্যা— গরমে বাচ্চাদের খিদে কমে যাওয়ার প্রবণতা। আপনার বাড়ির বাচ্চাটিও কি গরমে কিছুই খেতে চাইছে না? তাই নিয়ে আপনি চিন্তিত? গরমকালে শিশুদের এমনিতেই খাওয়ার প্রতি ততটা রুচি থাকে না।

কেন এমন হয়?

প্রথমত, গ্রীষ্মকাল শিশুরা ভীষণ ঘামতে থাকে। ফলে, তাদের শরীর ডিহাইড্রেট হয়ে যায়। ডিহাইড্রেশন হওয়ার কারণে তারা ঠিকমতো খেতে চায় না। আমরা যখন খাবার খাই, তখন তা আমাদের শরীরে তাপ উৎপাদনে সাহায্য করে। এই সময় আবহাওয়া এমনিতেই গরম থাকে। ফলে হজমের যে প্রক্রিয়া, তা একটু ধীরগতিতে হয়। শরীর গরম থাকে বলে ক্যালরির চাহিদাও অর্ধেক হয়ে যায়। সেজন্য বাচ্চারা মোটেই খেতে চায় না। এছাড়াও গরমকালে তাপপ্রবাহজনিত যে অসুস্থতা দেখা দেয়। সেগুলোর উপসর্গ হিসেবেও খিদে কমে যেতে পারে। এই সময় সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, সংক্রমণ ইত্যাদি হয়ে থাকে। জলবাহিত অনেক রোগ যেমন— টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি হতে দেখা যায়। এগুলোর কারণেও খাবারে অরুচি হয়।

এই সময় বাচ্চাদের রুটিন পালটে যায়। গরমের ছুটি বা স্কুলের সময়টা বদলে যায়। সুতরাং, এতদিন যে রুটিনে তারা অভ্যস্ত ছিল, সেটা হঠাৎ করেই পালটে যায়। এটিও তাদের খিদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ভয় পাবেন না

গরমে শিশুরা ঠাণ্ডা, হালকা খাবার (স্যালাড, মরশমি ফল ইত্যাদি) খেতে বেশি পছন্দ করে। ভাত, রুটি জাতীয় প্রধান খাদ্যের প্রতি তাদের টান অনেকটাই কমে যায়। এর থেকে আমাদের মনে হয় যে, বাচ্চারা হয়তো খেতে চাইছে না। তবে গরমকালে এই যে ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়, এটা অস্থায়ী। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু যদি দেখা যায়, দীর্ঘসময় ধরে এটা চলেছে, বাচ্চার ওজন কমে যাচ্ছে বা অন্য কোনো উপসর্গ পাওয়া গেলে, তা রোগের ইঙ্গিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ঠিক রাখবেন কীভাবে?

সবসময় হাইড্রেটেড রাখতে ফ্লুইড বেশি দিতে হবে। তবে কখনোই রাস্তার রঙিন পানীয় নয়। পরিশুদ্ধ জল খাওয়ান এবং অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে। জলের পরিমাণ খুব বেশি হলে আবার খিদে কম যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মরসুমি ফল খাওয়ান। তরমুজ, আম, লিচু— এগুলোর প্রতি বাচ্চাদের আগ্রহ বেশি হয়। এতে শরীরে পুষ্টি যাবে। অতিরিক্ত তেলমশলাযুক্ত খাবার একেবারেই দেবেন না। সহজপাচ্য আর পুষ্টিযুক্ত খাবার দিতে হবে। যেমন— বেশি পরিমাণে শাকসবজি, স্যালাড ইত্যাদি।

একসঙ্গে অনেকটা খাবার দেবেন না।

জোর করে কখনো বাচ্চাকে খাওয়াতে যাবেন না। তাহলে খাবারের প্রতি অনীহা তৈরি হবে। যদি পরিবারের সকলে বসে এক টেবিলে খান আর পরিবেশটা একটু আরামদায়ক হয়, তাহলেই শিশু নিজেই খেতে চাইবে।

ইউরিন যাতে কম না হয়, সেজন্য ইউরিন আউটপুটে খেয়াল রাখা উচিত। প্রস্রাবের রং যদি গাঢ় হয়, তা কিন্তু ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ। বাচ্চাকে নিয়ে খুব গরমে বাইরে বেরোবেন না। সকালবেলা বা সন্ধ্যের পরই বাইরে বেরোনো উচিত। বাচ্চাকে একটা তাপমাত্রায় রাখতে চেষ্টা করুন। সবসময় হালকা, ঢিলেঢালা পোশাক পরাতে হবে। বার বার স্নান করাতে পারেন। শরীরের আরাম পেলে এমনিতেই খেতে পছন্দ করবে।

সবশেষে বলি, এটা ধীরে ধীরে কেটে যাবে। না কমলে একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। □

বাবুরাম শীল লেনের দত্ত পরিবারের রথযাত্রা

সপ্তর্ষি ঘোষ

‘রথের পাড়া’ হিসেবে মধ্য কলকাতার বউবাজার অঞ্চলের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। রথকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে যে আনন্দ ও উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়, কলকাতার অন্যত্র তা দেখা যায় না। বউবাজার অঞ্চলে বেশ কিছু বনেদি পরিবার আছে, যারা প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে অনুসরণ করে আজও রথযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপন করেন। আর্থ- সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আগের মতো আড়ম্বর না থাকলেও, আজও এলাকার কয়েকটি বনেদি বাড়িতে রথের দিন জগন্নাথদেব কোথাও একা বা অগ্রজ বলরাম এবং ভগিনী সুভদ্রা-সহ তিনজনে রথে আরোহণ করে পরিক্রমায় বের হন। এর মধ্যে সনাতন শীল লেনে ধরদের রথ, বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে নরোত্তম দে’র রথ, বাবুরাম শীল লেনে যদুনাথ দত্ত’র ঠাকুরবাড়ির রথ, মদন দত্ত লেনে উমেশ শীলের রথ, রমানাথ কবিরাজ লেনে আঢ্যিদের রথ, পঞ্চাননতলায় শীলদের রথ, নীলমণি দে এবং রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়ির রথ উল্লেখযোগ্য। সুদীর্ঘ ১৩০ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি পারিবারিক রথের কথা এই নিবন্ধে উল্লেখ করব।

৭ নম্বর বাবুরাম শীল লেনস্থ দত্ত পরিবারের ঠাকুরবাড়িতে রথযাত্রার রথযাত্রার সুচনা করেন দত্ত পরিবারের আদিপুরুষ যদুনাথ দত্ত। রথযাত্রা শুরুর নেপথ্যে এক কিংবদন্তীর কথা জানা যায়। এক রাত্রে জগন্নাথদেব তার স্বপ্নে আবির্ভূত হন এবং যদুনাথকে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ করেন।

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি বাড়িতেই শুরু করেন শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের পূজা। কিন্তু তার একান্ত বাসনা, ঠাকুরবাড়ি তৈরি করে জগন্নাথদেবকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা। অবশেষে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৮৯৬ সাল) বৈশাখ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদুনাথ দত্ত ঠাকুরবাড়ি তৈরি করে জগন্নাথদেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি দত্ত পরিবারের রথযাত্রা প্রতি বছর বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এবারে এদের রথযাত্রা ১৩০তম বর্ষে পদার্পণ করলো। ঠাকুরবাড়ির দোতলায় কাষ্ঠনির্মিত সিংহাসনে জগন্নাথদেব অধিষ্ঠিত। এছাড়া জগন্নাথদেবের ডানদিকে রুপোর সিংহাসনে নারায়ণ, বামদিকে অন্য সিংহাসনে লক্ষ্মী ও মঙ্গলচণ্ডী আসীন। জগন্নাথদেবের নিত্যসেবা এবং বিভিন্ন উৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য যদুনাথ দত্ত ১৯১১ সালে চারটি বাড়ি জগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গ করেন।

স্নানযাত্রার দিন সকালে ঠাকুরবাড়ির দোতলার বারান্দায় আমপাতা ও কলাগাছ দিয়ে ঘর বানিয়ে সেখানে জগন্নাথদেবকে এনে বসানো হয়। নানাবিধ দ্রব্য দিয়ে জগন্নাথদেব মন্দিরে ফিরে যান। স্নানযাত্রার পরদিন অসুস্থতার জন্য জগন্নাথদেবকে আদা, খই, বাতাসা এবং দ্বিতীয় দিনে পাঁচন দেওয়া হয়। এরপর জগন্নাথদেবের ‘অনবসর’। অমাবস্যায় নবযৌবন প্রাপ্ত হয়ে জগন্নাথদেব পুনরায় মন্দিরে ফিরে আসেন।

একদিন বাদেই রথযাত্রা। রথের দিন সকালে জগন্নাথদেবকে রথে বসিয়ে ঠাকুরবাড়ির উঠোনে পরিবারের সদস্যরা রথ টানেন। দ্বিপ্রহরে জগন্নাথদেবকে বিশেষ পূজা ও ভোগারতি। সন্ধ্যায় নারায়ণ ও জগন্নাথদেব সুসজ্জিত রথে আরোহণ করে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে পরিক্রমায় বের হন। দত্ত পরিবারের শরিকদের বাড়িতে পূজা ও ভোগ গ্রহণ করে জগন্নাথদেব আবার ঠাকুরবাড়িতে ফিরে আসেন।

সোজা রথ থেকে উলটোরথ পর্যন্ত জগন্নাথদেব ঠাকুরবাড়ির একতলায় রুপোর সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন। এই ৮ দিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসর বসে ঠাকুরবাড়িতে। সোজো রথের অব্যবহিত পরবর্তী শনিবার জগন্নাথদেব শ্বেতপদ্মবেশ এবং রবিবার লাল পদ্মবেশে সজ্জিত হন। উলটোরথের আগের দিন হয় জগন্নাথদেবের ‘রাজবেশ’। এই বেশ অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। রথের ক’দিন জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে বহু ভক্ত সমাগম হয় এবং প্রত্যেককে প্রসাদ দেওয়া হয়। সোজা রথ থেকে উলটোরথের মধ্যবর্তী এক মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় বিপত্তারিণী ব্রত। সেদিন দত্ত পরিবারের মহিলারা সমবেত হন ঠাকুরবাড়িতে। উলটোরথে আবার পরিক্রমায় বেরিয়ে কয়েকজন শরিকের বাড়ি ‘দ্বারভোগ’ খেয়ে জগন্নাথদেব ফিরে আসেন ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ির প্রবেশ পথে লক্ষ্মী ও জগন্নাথদেবের মালা বদল এবং ‘যুগল মিলন’ হয়। তারপর দু’জনকে রুপোর সিংহাসনে বসানো হয়। মহিলারা এই সময় ‘যুগল মিলন’-এর গান করেন। এরপর ভোগারতি করে রথযাত্রা উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। □

২০১৪ সালের পর নতুন ভারতের উদয়

নারায়ণশঙ্কর দাশ

সমাজে অনেকে রয়েছে যাদের তুষ্টীকরণের আবহে থাকার অভ্যাস। সমাজের সামগ্রিক সন্তুষ্টীকরণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত তুষ্টীকরণের করুণা পেয়েই তারা খুশি। অসামাজিক কাজকর্মে হাত পাকানো কিছু সমাজবিরোধী বোমা-গুলির মাধ্যমে সমাজকে সন্ত্রস্ত রাখে। এই সমাজেরই বহু লোক সাধুসন্তদের পরিবর্তে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, চরিত্রহীন রাজনৈতিক নেতা ও সমাজবিরোধীদের করজোড়ে নমস্কার করে থাকে। এখনও সমাজের একটা বড়ো অংশ 'ডেমোক্রসি' বলতে 'হিপোক্রিসি'কেই বোঝে। কিছু ব্যক্তির কাছে 'স্বাধীনতা'র অর্থ হলো স্বেচ্ছাচার। আগে কিছুটা কম দাম দিয়ে রেশন সংগ্রহ করত দেশের লোকজন। বর্তমানে বিনামূল্যে রেশন পাওয়া যায়। আগে ভারতের ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাসের সংযোগ ছিল না। যাদের ছিল না, তাদের অনেককেই মাঝেমধ্যে ঘুরপথে, বেশি টাকার বিনিময়ে রান্নার গ্যাস সংগ্রহ করতে হতো। নতুন ভারতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে রান্নার গ্যাসের সংযোগ।

আগে ভারতে গরিব মানুষ পাকা বাড়ির স্বপ্ন দেখত। নতুন ভারতে তাঁদের সকলের না হলেও অনেকেরই স্বপ্নপূরণ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে। ভারতে সরকারি স্তরে দুর্নীতির প্রথম অভিযোগ ওঠে স্বাধীনতার পরের বছর, ১৯৪৮ সালে। লন্ডনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ভিকে মেননের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য জিপ গাড়ি কেনার বরাত দেওয়া সম্পর্কিত অভিযোগ ওঠে। তারপর থেকে ভারত সরকারের শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকে। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বহাল তবিয়তে চলে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং দেশকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আর্থিক কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতি। বিভিন্ন সময়ে দৈনিক সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জমানায় ৩৮৮৯.৩৫ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘটেছে। নরসিংহ রাওয়ের জমানায় ১৫,৬০৪ কোটি টাকার। মনমোহন সিংহের জমানায় ২জি স্পেক্ট্রাম কেলেঙ্কারিতে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার মতো বড়ো মাপের আর্থিক দুর্নীতির কথা তো ছেড়েই দিলাম।

২০১৪ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় ভারতে আসে এক নতুন সময়কাল। উদয় হয় এক নতুন ভারত। ২০১৪ সাল থেকে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আর্থিক কেলেঙ্কারির নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই হচ্ছে নয়া ভারত। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর গর্বের ভারত। না, ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন--- 'দুর্নীতি ছিল এদেশে অর্থনৈতিক সন্ত্রাস'।

২০১৪ সালে ভারতের অর্থনীতি ছিল বিশ্বের মধ্যে দশম স্থানে। বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ভারত। ২০১৪ সালের আগে ভারতে ন্যাশনাল হাইওয়ে (জাতীয় সড়ক) নেটওয়ার্ক ছিল ৯১,২৮৭ কিলোমিটার। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৪৬,১৫৫ কিলোমিটার। ২০১৪ সালের আগে রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশন ছিল মাত্র ১০ হাজার কিলোমিটার। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার কিলোমিটার।

২০১৪ সালের আগে ভারতে বিমানবন্দরের সংখ্যা ছিল ৭৪টি। বর্তমানে সেই সংখ্যাটি প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৭টিতে। ২০১৪-র আগে ভারতের নিজস্ব তৈরি ('মেড ইন ইন্ডিয়া') অস্ত্রশস্ত্র ছিল ভারতের অস্ত্রভাণ্ডারের ৩২ শতাংশ। বর্তমানে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৪ শতাংশ। ২০১৪ সালে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নামক একটি সরকারি উদ্যোগের কথা ঘোষণা করে কেন্দ্র। বর্তমানে বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশ 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের ফসল ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র কিনছে। বিষয়টি হলো একটি সময়গত পার্থক্য। মাত্র এক যুগের মধ্যে দেশের নানা ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য সকলের চোখে পড়ছে। এই বিষয়টি আজ অধিকাংশ দেশবাসী বুঝতে পারছে। ছিদ্রান্বেষণকারী ভারত-বিদ্বেষীদের আজ মুখ লুকোনোর মতো কোনো জায়গা নেই। □

নাগপুর রেশিমবাগে কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয়'র সমাপন সমারোহ

মহারাষ্ট্রের নাগপুরস্থিত রেশিমবাগ ময়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বিকাশ বর্গ দ্বিতীয় গত ১২ মে শুরু হয়ে ১ জুন সমাপন সমারোহ সম্পন্ন হয়। এই বর্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৮৪০ জন শিক্ষার্থী কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কার্যকর্তাদের শিক্ষাদানের জন্য সারা দেশ থেকে ১১৮ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বর্গে দক্ষিণ ক্ষেত্র থেকে ১৭৮ জন, পশ্চিম ক্ষেত্র থেকে ৮৬ জন, মধ্যক্ষেত্র থেকে ১১২ জন, রাজস্থান ক্ষেত্র থেকে ৭৯ জন, উত্তর ক্ষেত্র থেকে ৭৭ জন, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ক্ষেত্র থেকে ৭৮ জন, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ক্ষেত্র থেকে ৭৮ জন, বিহার ক্ষেত্র থেকে ৩৯ জন, পূর্বক্ষেত্র থেকে ৬৭ জন এবং অসম ক্ষেত্র থেকে ৪৬ জন শিক্ষার্থী কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এমন ১৮ জন, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৭৯ জন, ডিপ্লোমাধারী ৩১ জন, স্নাতক ৩৯০ জন, স্নাতকোত্তর ৩৭৭ জন, পিএইচডি ডিগ্রিধারী ৫জন ছিলেন। শ্রেণী অনুসারে অধিবক্তা ২৮ জন, ইঞ্জিনিয়ার ১৮ জন, সরকারি কর্মচারী ১৫৪ জন, শ্রমিক ২৭ জন, কৃষক ৫৫ জন, চিকিৎসক ৪ জন, সাংবাদিক ৫ জন, প্রচারক/বিস্তারক ১৯১ জন, অধ্যক্ষ/ অধ্যাপক ১৩ জন, ছোটো শিল্পপতি ৮ জন, ছোটো ব্যবসায়ী ৬৫ জন, ছাত্র ৬০ জন, শিক্ষক ৯১ জন এবং স্বরোজগারী ১২১ জন ছিলেন।

সমাপন সমারোহে প্রধান অতিথি রূপে মঞ্চাসীন ছিলেন পূর্বতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সামাজিক কার্যকর্তা অরবিন্দ নেতাম, সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত, বিদর্ভ প্রান্ত সঙ্ঘচালক দীপক তামশেট্টীওয়ার, বর্গের সর্বাধিকারী সমীর কুমার মহান্তি এবং নাগপুর মহানগর সঙ্ঘচালক রাজেশ লোয়া।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার পূর্বতন কংগ্রেসম্যান তথা হাউস ট্রান্সপোর্টেশন কমিটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিল শুস্টার; আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ, ব্যবসা বিশেষজ্ঞ এবং ওয়ান প্লাস স্ট্র্যাটেজিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও অংশীদার বব শুস্টার; আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিয়ম বিশেষজ্ঞ ব্র্যাডফোর্ড এলিসন; প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, লেখক, আন্তর্জাতিক মামলা, নীতি ও রণনীতি বিশেষজ্ঞ তথা ফ্লোরিডার হাডসন ইউনিভার্সিটি এবং ইতালির এস্পেন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক প্রফেসর ওয়াল্টার রাসেল মেড এবং এআই এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, হডসন ইউনিভার্সিটির ফেলো, আমেরিকা-ভারত সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, সিএনএন, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের নিয়মিত লেখক বিল ড্রেকসেল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীনেতাম তাঁর ভাষণে বলেন, ধর্মান্তরণ ও মাওবাদ এই দুটি জনজাতি সমাজের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা নিরসনে সঙ্ঘ ও জনজাতি সমাজকে একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদ নির্মূলীকরণে সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিন্তু তাকে মূল থেকে উৎখাতের জন্য সঙ্ঘকে আরও এগিয়ে আসতে হবে। সরসঙ্ঘচালকজী তাঁর ভাষণে বলেন, নিজেদের সুরক্ষার বিষয়ে আমাদের 'স্ব'-নির্ভর হতে হবে। এর জন্য সেনাবাহিনী, শাসন-প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শক্তিও প্রয়োজন। সেই শক্তি নির্মাণের জন্যই সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের বিকাশের ওপর জোর দেয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষার্থী কার্যকর্তারা শারীরিক ও ঘোষের (বাদ্যযন্ত্র) নানান কলাকৌশন প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বিশাল সংখ্যায় নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার ছাত্রশক্তি এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে গত ৮ জুন কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বিবেকানন্দ সভাগৃহে রত্নগর্ভা মাতৃ ও পরিবার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন সাহা ইনস্টিটিউট অব

লোকপ্রজ্ঞার ছাত্রশক্তি এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে রত্নগর্ভা মাতৃ ও পরিবার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিজ্ঞানী ডঃ দুলাল সেনাপতি, স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক

ডঃ বিজয় আঢ্য, ভারতীয় সেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ডঃ কুণাল ভাট্টাচার্য, এবং বেলুড় বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন তথা লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য সংযোজক ডঃ সোমশুভ্র গুপ্ত। ঠিক সকাল ১০টায় বৈদিক মন্ত্রোচ্চরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। তারপর পূজনীয় মহারাজ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ চতুর্ভুজা ভারতমাতা, শ্রীশ্রীঠাকুর-মা স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান। তারপরেই লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য সংযোজক ডঃ সোমশুভ্র গুপ্ত স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবগত করান। অনুষ্ঠানের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ডঃ সেনাপতি উপস্থিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মনে করিয়ে দেন দেশের জন্য তাদের অনেক কিছু করার আছে, দেশ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পূজনীয় মহারাজ তাঁর আশীর্বচনে বলেন, ভারতবর্ষ বহু অবতার পুরুষের জন্ম দিয়েছে আর সেই অবতার পুরুষদের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন তাঁদের মা। ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতীয় মায়েরা তাঁদের সন্তানদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, সিবিএসই এবং আইসিএসই-র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর রাজ্যে প্রথম দশে থাকা ৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এবং লোকপ্রজ্ঞা পরিবারের ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে সম্পৃক্ত অঙ্কন, গীতাপাঠ, দাবা, যোগাসন প্রভৃতিতে বিশেষ কৃতী ৭ জন এবং তাদের রত্নগর্ভা মাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিনটি পর্যায়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ছিল বাঁকুড়া পাঁচমুড়া কলেজের অধ্যাপক ডঃ পার্থজিৎ সেনগুপ্ত এবং স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ির সন্ন্যাসী স্বামী মাতৃরূপানন্দ মহারাজের অনবদ্য সংগীত পরিবেশনা। ছাত্রী প্রাপ্তি পালের কণ্ঠে 'বিলের ডায়েরি' আবৃত্তি অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লোকপ্রজ্ঞার মধ্যবঙ্গ সংযোজক মিলন কুমার দে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক ডঃ সুমন পাণিগ্রাহী। ছাত্রী কস্তুরী পাণ্ডের কণ্ঠে বন্দেমাতরম গান এবং শান্তিমন্ত্রের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্ত প্রবেশ শিক্ষা বর্গ

এবছর রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্ত প্রবেশ শিক্ষা বর্গের আয়োজন করা হয়েছিল বাঁকুড়া জেলার তাজপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে। গত ১৮ মে থেকে এই বর্গ শুরু হয়ে সমাপ্তি হয় ২

জুন। রাজ্যের ১২টি জেলা থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর অধ্যয়নরত ছাত্রী, চাকুরিজীবী ও গৃহিণী মিলিয়ে মোট ৫৫ জন সেবিকা এই বর্গে শিক্ষার্থী রূপে অংশগ্রহণ করেন। বর্গের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির অখিল ভারতীয় সহ শারীরিক প্রমুখ পখিলা বোরো এবং প্রান্ত ও জেলাস্তরের কার্যকর্ত্রীরা। বর্গে সর্বাধিকারী রূপে ছিলেন সমিতির বীরভূম জেলা কার্যবাহিকা মৌসুমী মণ্ডল এবং বর্গ কার্যবাহিকা রূপে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কার্যবাহিকা সুপ্রভা সামন্ত। বর্গ সুচারু রূপে সঞ্চালনার জন্য ৫ জন শিক্ষিকা এবং ৩ জন প্রবন্ধিকা নিযুক্ত ছিলেন। বর্গে শারীরিক বিকাশ, আত্মরক্ষা, নিজেকে সুস্থ রাখা, যোগচাপ, দণ্ড, যষ্টি, নিযুদ্ধ, পদবিন্যাস, গণসমতা, যোগাসন, যোগব্যায়াম, খেলাধুলা এবং বাদ্যযন্ত্র (ঘোষ)-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য ছিল সংবাদ সত্র, চর্চা, বৌদ্ধিক প্রভৃতি। বর্গে উপস্থিত থেকে সেবিকাদের পথনির্দেশ করেন সমিতির অখিল ভারতীয় সহ কার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকর, অখিল ভারতীয় সহ সেবাপ্রমুখ তথা দক্ষিণ অসম প্রান্ত প্রচারিকা সুপর্ণা দে এবং অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক টোলির সদস্যা তথা পূর্বক্ষেত্র প্রচারিকা লতিকা পাড়ি।

বর্গ চলাকালীন গত ২৬ মে শিক্ষার্থীদের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর দর্শন এবং শ্রী মা সারদাদেবীর বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। ৩১ মে পথসঞ্চলনে তাজপুর গ্রাম পরিক্রমা করেন সেবিকারা। ১ জুন ভারতমাতার পূজার আয়োজন করা হয় বর্গে। সামূহিক ভজন ও আরতিতে অংশগ্রহণ করেন সেবিকারা। তাতে তাঁদের মনে ভাবাবেগের সঞ্চার হয়। ২ জুন সকালে শিক্ষার্থীগের অনুভব কথন ও দীক্ষান্ত অনুষ্ঠান হয়। বিকেলে প্রকাশ্য কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শিহড় সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা আত্মশ্রদ্ধাপ্রাণা মাতাজী এবং প্রব্রাজিকা ঋতজাপ্রাণা মাতাজী। শিক্ষার্থীরা সামূহিক গান, যোগাসন, মানবন্দনা, যোগচাপ, যষ্টি, নিযুদ্ধ, ধ্বজসঞ্চলন ও ব্যায়ামযোগ প্রদর্শন করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রান্ত সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ মৌমিতা বর। বর্গবৃত্ত নিবেদন করেন বর্গ সর্বাধিকারী। আত্মশ্রদ্ধাপ্রাণা মাতাজী মা সারদার জীবনের ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দিশা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা সুপর্ণা দে সমিতির পরিচয়ের পাশাপাশি বর্তমান সামাজিক সমস্যা এবং তার মোকাবিলায় সেবিকাদের ভূমিকা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে হিন্দুরাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণে পঞ্চ পরিবর্তনের ওপর জোর দেন। এরপর বর্গ কার্যবাহিকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বন্দেমাতরম গীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

চাঁচলে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

গত ৬ জুন মালদহ জেলার চাঁচল শহরে 'চাঁচল নবজাগণ সমিতি'র উদ্যোগে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়। মূর্তির আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির মালদহ বিভাগ সামাজিক সমরসতার সহ সংযোজক দীপক চট্টোপাধ্যায়, জেলা সমরসতা প্রমুখ তারাপদ মণ্ডল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর মালদা জেলা সভাপতি নেন্টু গঙ্গোপাধ্যায়, প্রখণ্ড সম্পাদক ঋতম দাস, টুবাই পাল-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মাতৃমণ্ডলীর দ্বারা মূর্তির অভিষেক করা হয় গঙ্গাজল ও দুধ দিয়ে। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে পূজা-অর্চনা সম্পন্ন হয়। দীপক চট্টোপাধ্যায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের গুরুত্ব, তাঁর সমরকুশলতা, শাসন ব্যবস্থা এবং হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষার কথা তুলে ধরেন।

বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের বার্ষিক অধিবেশন

সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক অধিবেশন গত ৮ জুন বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন সীমা জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংযোজক শ্রী মুরলীধর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগঠন সম্পাদক গণেশ পাল এবং রাজ্য সভানেত্রী শ্রীমতী অঞ্জুলা বিনায়িকা। অধিবেশনে রাজ্যের ১২৫ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কার্যকর্তাদের সামনে শ্রীমুরলীধর বলেন, সীমান্ত সুরক্ষিত থাকলে দেশ সমৃদ্ধ হবে। সেজন্য দেশের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে সংগঠিত করতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে আর যেন দেশ ভাগ না হয়। নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা (সিএএ) শারণার্থীরা যাতে লাভান্বিত হয় যে ব্যাপারে কার্যকর্তাদের সচেতন থাকতে হবে। শ্রীপাল বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ভারতমাতাকেই একমাত্র আরাধ্য দেবী হিসেবে মনে করতে হবে। তাই আগামী ২৬ জানুয়ারি সমস্ত গ্রামে ভারতমাতার পূজার আয়োজন করতে হবে এবং ১৪ জানুয়ারি গঙ্গাপূজার মাধ্যমে মা গঙ্গাকে স্বচ্ছ রাখার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। শ্রীমতী বিনায়িকা বলেন, আমাদের কার্যকর্তাদের আরও সক্রিয় হয়ে সীমান্তের কাজকে দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে যাতে সীমান্ত দিয়ে কোনো অবৈধ অনুপ্রবেশ না হয়। পরিশেষে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান। জাতীয় সংগীতের পর অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক দিবস স্মরণে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ দমনের ভারতীয় সেনা অভিযান ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সাফল্য এবং ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ৩৫১তম রাজ্যাভিষেক দিবস স্মরণে গত ৮ জুন বৈভবী শাম্ভাবী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং ড. হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির সহযোগিতায় উত্তর কলকাতা-স্থিত বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে সভাগৃহে আয়োজিত হয় একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা-র সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য এবং কলকাতা মহানগরের পূর্বতন সঙ্ঘচালক সুশীল কুমার রায়। শান্তিমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নগরের স্বয়ংসেবকরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্য-সদস্যারা কবিতা আবৃত্তি করেন এবং একাধিক সংগীত পরিবেশন করেন। সমবেত কণ্ঠে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের উপর একটি সংগীত পরিবেশন করেন জয়দীপ রায়চৌধুরী, তনুময় ঘোষ, শ্যাম পাল, অরিন্দম দে, অর্ঘ্যলাল মিত্র ও সঞ্জীব দাশ। এছাড়াও শৈলেন পালের নির্দেশনায় একটি নাটক মঞ্চস্থ করে শ্যামপুকুর সায়ম শাখার স্বয়ংসেবকরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অভীক সেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি সংবর্ধন সমিতির সংস্কার শিবির

ভারতীয় সংস্কৃতি সংবর্ধন সমিতির উদ্যোগে গত ৬-৭ জুন দিনের গ্রীষ্মকালীর সংস্কার শিবিরের আয়োজন করা হয় মানিকতলাস্থিত মহর্ষি দধিচী ভবনে। শিবিরে ৬ থেকে ১৪ বছরের ৬৫ জন ছেলে-মেয়ে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মহাবীর বাজাজ, ব্রহ্মানন্দ বংগ, আচার্য প্রকাশ পাণ্ডে এবং শৈলেশ বাগড়ী। শ্রীবংগ অনুশাসন এবং শ্রীবাজাজ রাষ্ট্রভক্তিমূলক গল্পের মাধ্যমে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। শিবিরে দুদিন ধরে বালক-বালিকারা সুভাষিতম্, দেশাত্মবোধক গান, আত্মরক্ষামূলক শিক্ষা, অঙ্কন, ব্রেন গেম, নৃত্য এবং বিভিন্ন খেলাধুলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বালক-বালিকাদের শংসাপত্র এবং উপহার প্রদান করা হয়। শিবিরকে সফল করতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন সঞ্জয় মণ্ডল, পূনম গোণ্ড (সংযোজিকা), নীতিন আর্য, কমল শা, রোহিত শর্মা, প্রীতি সেঠিয়া, কৌশিক ঘোষ, রাজকুমার ভালা, রেণুকা শর্মা প্রমুখ।

আগরতলায় 'সনাতনী যুব ত্রিপুরা'র উদ্যোগে আলোচনা সভা

গত ১১ জুন ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার সুকান্ত অ্যাকাডেমি মিলনায়তনে 'সনাতনী যুব ত্রিপুরা'র উদ্যোগে 'হিন্দু ইশতেহার' শীর্ষক আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন শান্তিকালী আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজ, সনাতনী যুব ত্রিপুরার আহ্বায়ক শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক। শ্রীমতী নীলিমা ঘোষ বলেন, হিন্দু ম্যানিফেস্টো বইটি স্বামী বিজ্ঞানানন্দের

গভীর ও বিস্তৃত গবেষণার ফসল। বইটিতে ৮টি অধ্যায় রয়েছে যা একটি সমাজকে আদর্শের দিকে পরিচালিত করতে পারে। লেখক বইটিতে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিভিন্ন দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত গত ২৬ এপ্রিল বইটি প্রকাশ করেছেন।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ৫ জুন নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামে চারাগাছ বিতরণ করে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির। অনুষ্ঠানে

গ্রামবাসীদের সামনে গাছ লাগানোর উপযোগিতা সম্পর্কে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মিলন খামারিয়া বলেন, সারা পৃথিবীতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে গাছ লাগানোর মাধ্যমে। গাছ আছে বলেই আমরা অক্সিজেন-সহ ফুল-ফল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী পেয়ে থাকি। সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে এই গাছ। তাই সবদিক দিয়ে বলা যায়, গাছ আমাদের পরম বন্ধু। কৃষি বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন সেবাকাজ করে চলেছে, তার মধ্যে গাছ লাগানো অন্যতম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সদস্য রাজকুমার খামারিয়া, তাপস মোদক, কার্তিক বিশ্বাস প্রমুখ।

শ্রীঅরবিন্দ ভবনে 'রাজ থেকে স্বরাজ : স্বাদেশিকতা ও শিল্প-সংস্কৃতি'- শীর্ষক প্রদর্শনী

মধ্য কলকাতায় ৮, শেক্সপিয়র সরণি-স্থিত শ্রীঅরবিন্দ ভবনে 'কলকাতা কথকতা'-সহ নানা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গত ৬-৮ জুন আয়োজিত হয় 'রাজ থেকে স্বরাজ : স্বাদেশিকতা ও শিল্প-সংস্কৃতি' -শীর্ষক একটি প্রদর্শনী। শ্রীঅরবিন্দ ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সংগ্রামের ইতিহাস ছিল এই প্রদর্শনীর

উপজীব্য। প্রদর্শনীটিতে সহযোগী ছিল নিউমিসম্যাটিক্স সোসাইটি, কলকাতা ও বাংলালাইভ ডট কম। প্রদর্শনীতে যোগ দেয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম'। কলকাতা কথকতা-র ২১ জন সংগ্রাহকের পাশাপাশি ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী বসন্ত কুমার বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস প্রমুখের ব্যক্তিগত নানা সংগ্রহ তিনদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে ছিল শ্রীঅরবিন্দ, মাদার আলফাসা (শ্রীমা)-সহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সংক্রান্ত এবং তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত নানা অমূল্য সংগ্রহ। গত ৬ জুন প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৌত্রী অদিতি মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল কুমার সেন-সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রদর্শনীর প্রথম দিনে উদ্বোধন পর্বে প্রকাশ পায় জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের সংগ্রহ থেকে অষ্টাদশ শতকে উইলিয়াম উডের লিথোগ্রাফে কলকাতার ছবি এবং ওল্ড বেঙ্গল চিত্রকৃতিসমৃদ্ধ দু'টি পিকচার পোস্টকার্ডের সেট এবং পুরনো কলকাতার ট্রাম-টিকিটের আদলে তৈরি বুকমার্ক সেট। বিশ শতকের প্রথম পাঁচ দশকে (১৯০০-১৯৫০) স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের অভিযাত্রা ফিরে দেখাই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

প্রদর্শনীতে স্থান পায় আলিপুর বোমা মামলার নথিপত্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশিত বন্দেমাতরম পত্রিকা, স্বদেশি প্রচারপত্র, ক্যালেন্ডার, বিপ্লবী বীণা দাস, সুধাংশু বিশ্বাস, শ্রীঅরবিন্দ-বারীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা চিঠি ও ব্যক্তিগত সামগ্রীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, স্বদেশী বিজ্ঞাপন ও সূচিশিল্পে স্বাধীনতা-কথা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখের এবং বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রয়াণের পরদিন প্রকাশিত খবরের কাগজগুলিও স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মারক খবরের কাগজ হিসেবে প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এছাড়াও ছিল সুভাষচন্দ্র বসু, সরোজিনী নাইডু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বরেণ্যদের অটোগ্রাফ-সংগ্রহ। ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণশতবার্ষিকীকে স্মরণ করে প্রদর্শনীতে ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দল সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক চিত্র ও নথিপত্র।

স্বাদেশিকতা বোধ দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, সেই ইতিহাসও প্রতিফলিত হয় এই প্রদর্শনীতে। আঠারো থেকে বিশ শতকের ওল্ড বেঙ্গল পেন্টিং, লিথোগ্রাফ ও কাঠখোদাই যন্ত্র, পোর্সেলিনের পুতুল, এনামেলের বিজ্ঞাপন-বোর্ড, পুস্তিকা, দেশলাই (অস্ট্রিয়াতে ছাপা দেশীয় রাজাদের ছবি দেওয়া দেশলাই বাক্সের লেবেল), স্বদেশী ব্যাজ, ঘোড়ার গাড়ির লণ্ঠন, বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য বইপত্র, গ্যাসবাতি, স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে সিনেমার বিজ্ঞাপন, বুকলেট, তৎকালীন নিত্যব্যবহার্য নানা স্বদেশী দ্রব্য ও তার বিজ্ঞাপন-লেবেল, বিবাহের পদ্য ও অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র, কার্ড ক্যাবিনেট, ব্রোমাইড ফোটো— প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে নানাবিধ ঐতিহাসিক নিদর্শন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুলের স্বকণ্ঠে গ্রামোফোন রেকর্ডিং, পরাধীন ভারতের মুদ্রা ও ব্যাংক নোট, কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের সময়কালীন 'দিল্লি দরবার' অনুষ্ঠানের স্মারক-সহ সূচিচিত্র ও এনামেল বোর্ডে ছাপা বিভিন্ন ছবিতে দর্শকরা দেখতে পান একখণ্ড অতীত ইতিহাস। বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি-র সম্পাদক তরুণ বিশ্বাসও তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরেন। তাঁর পিতামহ ডাঃ ললিতমোহন বিশ্বাসকে লেখা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দু'টি চিঠির প্রতিলিপি তিনি প্রদর্শনীতে উপস্থিত সাংবাদিক ও বিশিষ্টজনেদের হাতে তুলে দেন। প্রদর্শনীর শেষ দিনটিতে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অশোকনাথ বসুর কন্যা জয়ন্তী রক্ষিত (বসু)।

শ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য চির অমলিন

গোপাল চক্রবর্তী

চারধামের অন্যতম জগন্নাথ ধাম ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। শুধু তীর্থক্ষেত্র নয়, যুগ যুগ ধরে এর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ভারতবাসী তথা বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও সৌন্দর্যপিপাসু মানুষকে আকর্ষণ করে আসছে। জগন্নাথ ধামের প্রতিষ্ঠা ও জগন্নাথ মাহাত্ম্যের সঙ্গে যে পৌরাণিক কাহিনি যুক্ত তাও কম আকর্ষণীয় নয়।

পুরাকালে অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসক, পরমধার্মিক ও প্রজাবৎসল। একদা তিনি এক পরিব্রাজকের কাছে শুনলেন দক্ষিণদেশে শ্রীপুরুষোত্তম নামে এক অতি উত্তম ক্ষেত্র আছে। সেখানে নীলগিরি নামে এক পর্বত আছে। জগন্নাথরূপী শঙ্খ-চক্র- গদা-পদ্মধারী স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু সেখানে বিরাজিত। সেই দেবকে দর্শন করলেই চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়। পরিব্রাজক ব্রাহ্মণের মুখে এমন অপূর্ব কথা শুনে নৃপতির মন বিচলিত হলো। তিনি অবন্তীনগর ত্যাগ করে পুরুষোত্তমে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। রাজা যখন বসবাসের স্থান নির্ধারণের জন্য, সেই স্থান সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের সন্ধান করছিলেন তখন সেই পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ বললেন যে, তাঁর ভাই বিদ্যাপতি সেই পথ জানেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে দিয়ে বিদ্যাপতিকে পাঠালেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে আসার জন্য। ভক্তপ্রবর বিদ্যাপতিও জগন্নাথ দর্শনের আনন্দে অধীর হয়ে সহযাত্রীদের নিয়ে চললেন পুরুষোত্তমের পথে। মহানদী পার হয়ে ক্রমে অগ্রসর হলেন নীলাচলের দিকে।

বিদ্যাপতি নীলাচলের তলদেশে এলেন কিন্তু পর্বতে আরোহণের পথ খুঁজে পেলেন না। এমন সময় সদ্য পূজা সমাপ্ত করে এক শবর সেখানে এলেন। দ্বাদশ তিলক-সহ তাঁর সর্বাঙ্গ চন্দনচর্চিত। এই বৈষ্ণবকে দেখে বিদ্যাপতি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে বললেন— হে ভক্তপ্রবর, আমি অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতিনিধি। শ্রীবিষ্ণুর দর্শন অভিলাষে এখানে এসেছি। এক পরিব্রাজকের মুখে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর নীলমাধব রূপের কথা শুনেছেন। তাই তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন। যতদিন পর্যন্ত আমি নীলমাধব সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁর কাছে না ফিরে যাব, তিনি চরম উৎকণ্ঠায় থাকবেন। আমার স্থির বিশ্বাস আপনি আমাকে নীলমাধব দর্শন করাতে সক্ষম।

বিদ্যাপতির মুখে এই কথা শুনে শবররাজ বিশ্বাবসু চিন্তিত হলেন। প্রকাশ্যে বললেন— হে দ্বিজবর, আপনার অভীষ্ট পূরণেরও চেষ্টা করব। এখন আমার প্রার্থনা শুনুন। আপনি ব্রাহ্মণ, অতিথি, নারায়ণস্বরূপ, তদুপরি পথশ্রমে ক্লান্ত। আপনি সবান্ধবে আমার কুটিরে পদার্পণ করুন। কিঞ্চিৎ ফলাহার করুন। বিদ্যাপতি বললেন— হে নরোত্তম, আপনার ব্যবহার ও আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ, আহারাদি পরে হবে, আপনি অনুগ্রহ করে দিনমানে আমাকে প্রভুর দর্শন করান।

বিদ্যাপতির কাছে এরূপ কথা শুনে শবররাজ চিন্তান্বিত হলেন। নীলমাধবকে তিনি এতকাল সকলের অজ্ঞাতে একাকী পূজা করে আসছেন। ব্রাহ্মণকে নীলমাধবের দর্শন করালে তিনি প্রকাশ হয়ে পড়বেন। আর গোপন করলে অতিথি ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যাচারের পাপ হবে। তখন শবররাজের মনে হলো এক প্রাচীন জনশ্রুতি। নীলমাধব এক সময়ে ভূমিতলে অন্তর্হিত হবেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা এখানে এক পুরী নির্মাণ করে বিষ্ণুকে দারুমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই দিন কি সমাগত? এই ব্রাহ্মণ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতিনিধি হয়ে কি সেই বার্তাই বহন করে এনেছেন? শবররাজ ভাবলেন যা ভবিতব্য তা ঘটবেই। তারপর তিনি বিদ্যাপতিকে নীলমাধব দর্শনে নিয়ে গেলেন।

প্রস্তর আর কণ্টকে ভরা অতি সংকীর্ণ পথ। ক্রমে তাঁরা একে একে রৌহিন কুণ্ড, অক্ষয় বট পেরিয়ে কুঞ্জমধ্যে নীলমাধবকে দর্শন করলেন। শ্রীবিষ্ণুর এই রূপদর্শনে বিদ্যাপতি আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হলেন। প্রণামান্তে নানা স্তবস্তুতি করলেন। প্রভুকে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টির আড়াল করতে মন চাইছে না। তখন সূর্যদেব অস্তাচলে, বিদ্যাপতিকে ভাবাবিষ্ট দেখে বিশ্বাবসু বললেন— হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, প্রভুকে দর্শন করে তুমি ধন্য হয়েছ। এক্ষণে রজনী আগতপ্রায়, এই বন শ্বাপদসংকুল, এবার আমাদের কুটিরে ফিরতে হবে।

এই কথা বলে বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির হাত ধরে তাকে কুটিরে ফিরিয়ে এনে আহারে বসালেন। আহার্য বস্তু দেখে বিদ্যাপতি অবাক। এরূপ আহার্য রাজগৃহেও দুর্লভ। বিদ্যাপতির মনের অবস্থা বুঝে বিশ্বাবসু বললেন— হে ব্রাহ্মণ, এই আহার্য দেখে আপনি অবাক হচ্ছেন। যদিও এই রহস্য প্রকাশ করা উচিত নয়। তবুও আপনি ভক্তপ্রবর, আপনার কাছে এই রহস্য প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রতিদিন ইন্দ্রাদি দেবগণ জগন্নাথের পূজার জন্য এই দিব্যবস্তুসমূহ নিয়ে আসেন। পূজা, স্তব, নৃত্য, গীতাদি-সহ প্রভু জগন্নাথকে তুষ্ট করে আবার স্বর্গে ফিরে যান। এই সবই হলো সেই প্রসাদ।

বিদ্যাপতির আর ইচ্ছে হলো না এই স্থান ত্যাগ করে অবন্তীনগরে ফিরে যেতে, কিন্তু রাজার কাছে তিনি দায়বদ্ধ, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে গেলেন অবন্তীনগরে। রাজা সম্যক অবগত হয়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমনের আয়োজনে মনোনিবেশ করলেন। তিনি সকল প্রজাকে অবন্তী ছেড়ে তাঁর সঙ্গে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাওয়ার আদেশ দিলেন। পুরুষোত্তম যাত্রার প্রস্তুতি যখন সমাপ্তপ্রায় তখন রাজসভায় এলেন দেবর্ষি নারদ। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম শ্রদ্ধাভরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে এবং তাঁর সম্প্রতি পুরুষোত্তম যাত্রার অভিপ্রায় জানিয়ে নারদকে তাঁর সহযাত্রী হবার অনুরোধ জানালেন। প্রভু জগন্নাথের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নারদ এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। দেবর্ষি নারদ, পুরোহিত বিদ্যাপতির সঙ্গে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, রাজপরিবার, সাধারণ প্রজা এবং চতুরঙ্গ সেনাদল চলেছে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পথে। যেতে যেতে বহু তীর্থ দর্শন করে অবশেষে নীলাচলে উপস্থিত হলেন। রাজা প্রভু নীলমাধবের দর্শনাভিলাষে যখন আনন্দধারায় নিমজ্জিত তখন তাঁর অঙ্গে নানা অমঙ্গল চিহ্ন অনুভব করলেন। যেমন— বাম চক্ষু এবং বাম বাহুর ঘনঘন কম্পন ইত্যাদি। তারপর বিদ্যাপতির নির্দেশ অনুযায়ী যথাস্থানে গিয়ে নীলমাধবের দর্শন পেলেন না। মর্মাহত রাজা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর নারদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন—

—হে রাজন! যে নীলমাধবকে দেখার জন্য এত ক্লেশ সহ্য করে নীলাচলে এলে, সেই নীলমাধবরূপী শ্রীবিষ্ণু এখন অন্তর্ধান করেছেন। তোমার পুরোহিত বিদ্যাপতি যে মূর্তি দর্শন করেছেন তুমি আর তা দর্শন করতে পারবে না।

এই কথায় রাজা অত্যন্ত অধীর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তার বিলাপে দেবতাদের হৃদয় আর্দ্র হলো। তখন দৈববাণী হলো— 'হে রাজন, মনস্থির করো। শ্রীবিষ্ণু পাষাণরূপ ছেড়ে দারুরূপে প্রকটিত হবেন, তুমি যাগযজ্ঞাদি করে সেই দারুব্রহ্মের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করো।'

বাসস্থান না হলে যজ্ঞ করা অসম্ভব। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বকর্মার পুত্রকে ডেকে দুই ক্রোশব্যাপী নগরের পত্তন করালেন। তারপর যজ্ঞে সুনিপুণ ব্রাহ্মণ-সহ ঋষি, রাজন্যবর্গ ও সকল বর্ণের লোকদের নিমন্ত্রণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। মহাধুমধামে যজ্ঞ সম্পন্ন হলো। রাত্রিকালে শ্রীজগন্নাথ স্বপ্নযোগে রাজাকে দর্শন দিলেন, তাঁর শ্যামল সুন্দররূপ দেখে রাজা অভিভূত হলেন। পরদিন রাজার চরেরা সমুদ্রতীরে এক অত্যাশ্চর্য শ্বেত, নীল, পীত, রক্ত— এই চারবর্ণে শোভিত সুরভিত দ্যুতিময় ভাসমান দারুখণ্ড দেখতে পেল। এই সংবাদ রাজার গোচরীভূত হলে তিনি নারদের পরামর্শে এই দারুব্রহ্মকে মন্দির অভ্যন্তরে স্থাপন করলেন। এক শিল্পী এই দারুখণ্ডের নীল অংশ থেকে জগন্নাথ, শ্বেত অংশ থেকে বলরাম, পীত অংশ থেকে দেবী সুভদ্রা এবং লাল অংশ থেকে সুদর্শন মূর্তি নির্মাণ করলেন। দৈববাণী হলো— প্রতি বছর নতুন করে অঙ্গরাগ করতে হবে। শবররাজ বিশ্বাবসু আর রাজপুরোহিত বিদ্যাপতির বংশধররা প্রতি বছরই দারুমূর্তির অঙ্গরাগ করবে।

দেবর্ষি নারদ বললেন— 'হে রাজন! তুমি মহাভাগ্যবান। এই মহৎকর্ম সম্পাদন করে তুমি নিজে মুক্ত হবে, আর নরলোককে মুক্ত করবে।'

নারদের পরামর্শে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের মন্দির নির্মাণে উদ্যোগী হলেন। ব্রহ্মার আদেশে স্বয়ং বিশ্বকর্মা সপুত্রক এলেন শ্রীমন্দির নির্মাণের জন্য। হাজার হাজার মানুষ তাঁদের সাহায্য করতে এলেন। শ্রীমন্দির নির্মাণের আগে পাতাল-নৃসিংহদেবের অনুমতিগ্রহণ করা হয়। মাত্র তিনদিনে

সুবিশাল, সুদৃশ্য শ্রীমন্দির নির্মাণ হলো। মনুষ্য শিল্পীর পক্ষে যা শতবর্ষের কাজ। শ্রীমন্দিরের পূর্বদিকে সিংহদ্বার আর গর্ভগৃহে রত্নবেদী তৈরি হলো। আবার সুবর্ণ নির্মিত তিন বিগ্রহের তিনখানা সুদৃশ্য রথও তৈরি করলেন বিশ্বকর্মা।

দারুমূর্তির অভিষেক পূজার জন্য ব্রহ্মলোকে যান মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। ব্রহ্মলোকে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং দারুমূর্তির অভিষেক ও পূজা সমাপন করলেন। স্বর্গ থেকে দেবতারা এলেন মূর্তি দর্শনে। চারদিকে ধন্য ধন্য রব উঠল। এরপর মর্ত্যলোকে ফিরে এসে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীক্ষেত্র, পুরীধাম-স্থিত শ্রীমন্দিরের রত্নবেদীর উপর সেই দারুমূর্তি স্থাপন করলেন। প্রভুর নিত্য মহাপূজা আর মহাভোগের ব্যবস্থা করলেন। এইরূপে নীলাচলে দারুব্রহ্মরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অধিষ্ঠিত হলেন। কিন্তু ক্রমে কলির প্রভাব বাড়তে লাগল। তখন জগন্নাথদেব পুনরায় লীলা প্রকাশ করলেন। একদিন সকালে প্রধান পূজারি মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলেন, দারুমূর্তি যেন জরাগ্রস্ত, বেশভূষা ছিন্নভিন্ন, অপরূপ মূর্তি প্রভাহীন, বিকৃত। পূজারি আর্তনাদ করে উঠলেন, পরিচারকেরা সব দেখে বিমূঢ় থেমে গেল মঙ্গলবাদ্য। সংবাদ গেল মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে। তিনি মন্দিরে এসে এই বিকৃত মূর্তি দর্শন করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ এসে রাজাকে পূর্বকথা স্মরণ করালেন— স্বয়ং জগন্নাথ দৈববাণী করেছিলেন বিশ্বাবসুর বংশধরেরা প্রভুর অঙ্গরাগ করবেন আর বিদ্যাপতির বংশধরেরা প্রভুর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন, সন্ধান নাও সমুদ্রতীরে সেই দারুখণ্ড ভাসমান আছে। বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে মূর্তির পুনর্নির্মাণ করাও। কিন্তু বিশ্বকর্মা এসে দারুখণ্ড পরীক্ষা করে বললেন এই কঠিন দারুখণ্ড থেকে মূর্তি তৈরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, ফিরে গেলেন বিশ্বকর্মা। রাজা পড়লেন মহাচিন্তায়, নারদ আশ্বস্ত করে বললেন— ধৈর্য ধর, ভগবান আপনি প্রকাশ হবেন।

এই সময়ে যন্ত্রাদি নিয়ে উপস্থিত হলেন এক বৃদ্ধ সূত্রধর। তিনি দারুখণ্ড পরীক্ষা করে বললেন— আমি এই দারুখণ্ড থেকে মূর্তি তৈরি করব তবে আমাকে তিনদিন তিনরাত্রি সময় দিতে হবে। এই তিনদিনে কেউ শ্রীমন্দিরের নির্মাণকক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না। রাজা স্বয়ং দ্বার রক্ষা করবেন। এই নির্দেশ দিয়ে সেই বৃদ্ধ শিল্পী মন্দিরে প্রবেশ করে দ্বাররুদ্ধ করলেন। আর শুরু হলো অনবরত ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ। রাজা কিংবা অন্য কেউ বুঝতে পারলেন না যে এই বৃদ্ধ শিল্পী স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণু। দুই দিন দুই রাত্রি অনবরত কাজ হলো তৃতীয় দিনে শ্রীবিষ্ণু ভাবলেন যে তিনি এবার অঙ্গহীন রূপে প্রকটিত হবেন। এই অঙ্গহীন মূর্তিকে যে অশ্রদ্ধা করবে সে নরকগামী হবে। আর যে এই অঙ্গহীন মূর্তিকে শ্রদ্ধাভরে ভজনা করবে সে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হবে। এই লীলা প্রকট করার জন্য শিল্পীরূপী শ্রীবিষ্ণু নির্মাণ কার্য স্থগিত রাখলেন। রাজা ও রানি বাইরে থেকে দীর্ঘ সময় শব্দ না শুনে উৎকণ্ঠিত হলেন। ভাবলেন শিল্পী হয়তো কোনোভাবে আক্রান্ত হয়েছেন বা মূর্তির কাজ হয়তো সমাপ্ত হয়েছে। রানির অনুরোধে মহারাজ দ্বার খুলে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলেন। নির্মাণকক্ষ খুলে দেখলেন তিনটি অসমাপ্ত মূর্তি তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। সেই দারুশিল্পী অন্তর্হিত। হতাশায় ভেঙে পড়লেন মহারাজ। বুঝতে পারলেন এক মহা ভুল তিনি করে ফেলেছেন। অধৈর্য হয়ে রুদ্ধদ্বার খোলা তাঁর উচিত হয়নি। কারণ তখনও আট প্রহরের কাজ বাকি। এই মূর্তি আর সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না।

> **প্রতি বারো বছর অন্তে রথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নবকলেবর ধারণ করেন। পুরাতন মূর্তির নাভিদেশ থেকে 'আত্মা-ব্রহ্ম' গ্রহণ করে নবকলেবরে স্থাপন করেন শবররাজ বিশ্বাবসুর বংশধরেরা। হাজার বছরের হাজার বৈদেশিক আক্রমণ, হাজার প্রাকৃতিক বিপর্যয় উপেক্ষা করে শ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য আজও অমলিন।**

প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে এরপর হয় দৈববাণী, মতান্তরে জনশ্রুতি রয়েছে যে মহারাজের স্বপ্নদর্শন হয়। শ্রীভগবান রাজাকে বললেন— কলিযুগে এই মূর্তিই আমার লীলাস্বরূপ। তুমি যদি মোক্ষলাভ করতে চাও, তবে এই অঙ্গহীন মূর্তিকেই পূজা করো। আর একটি গূঢ় কথা তোমাকে বলছি, আগের জীর্ণ মূর্তির নাভিদেশের গোপন রন্ধ্রে ব্রহ্ম-আত্মা স্থাপিত আছেন। সেই আত্মাকে নবনির্মিত মূর্তির নাভিদেশে স্থাপন করতে হবে। তবে সেই কর্মের একমাত্র অধিকারী বিশ্বাবসু শবরের পুত্র, চোখে সাতপাট কাপড় বেঁধে এই কাজ করতে হবে। সেই ব্রহ্ম-আত্মাকে দর্শন করলে মৃত্যু অনিবার্য। আর সেই ব্রহ্ম-আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করবেন বিদ্যাপতি। প্রতি বারো বছর অন্তর এই অঙ্গহীন মূর্তি নবকলেবর ধারণ করবেন। বংশপরম্পরায় এই কাজ করবেন শবররাজ বিশ্বাবসু এবং বিদ্যাপতির বংশধররা।

এই কথা শেষ করেই সেই বৃদ্ধশিল্পী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজা বুঝতে পারলেন ইনিই ছদ্মবেশী প্রভু জগন্নাথ। তখন রাজা বিশ্বাবসুর পুত্রকে এনে নবনির্মিত মূর্তিতে ব্রহ্ম-আত্মা স্থাপন করালেন এবং রত্নবেদীর উপর শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি স্থাপন করে যথাবিধি পূজা-অর্চনা শুরু করলেন। ক্রমে মর্ত্যধামে ছড়িয়ে পড়ল শ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য। অদ্যাবধি প্রতি বারো বছর অন্তে রথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব নবকলেবর ধারণ করেন। পুরাতন মূর্তির নাভিদেশ থেকে 'আত্মা-ব্রহ্ম' গ্রহণ করে নবকলেবরে স্থাপন করেন শবররাজ বিশ্বাবসুর বংশধরেরা। হাজার বছরের হাজার বৈদেশিক আক্রমণ, হাজার প্রাকৃতিক বিপর্যয় উপেক্ষা করে শ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য আজও অমলিন। □

মহাপ্রভু জগন্নাথের ছাপান্ন ভোগ

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

জগন্নাথ আমাদের বড়ো প্রিয় দেবতা। তিনি শুধু দেবতা নন, স্বয়ং ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, দারুব্রহ্ম। তাঁর নামটি ঈশ্বর শব্দের সমার্থক। জগতের নাথ, তাই তিনি জগন্নাথ। শ্রীনামেই প্রভুর মহিমার সার্থক প্রকাশ। 'Imperial Gazetier of India'-তে একবার লেখা হয়েছিল হিন্দুজাতির ওপর জগন্নাথের অক্ষয় প্রভাবের কারণ হলো, তিনি আসলে মানুষের দেবতা।'

কিন্তু রূপে তিনি মানুষের মতো নন, তিনি বা বলভদ্র ও সুভদ্রা কারও দেহসৌষ্ঠব মানুষের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না; অন্যান্য দেব-দেবীর মতো এই তিন-ভাই-বোন দেখতে নন। প্রতিটি মূর্তি অসম্পূর্ণ। এছাড়া জগন্নাথের পাশে আছেন একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড। কাপড়ে আচ্ছাদিত, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্ররূপেই তা পূজিত কিন্তু চক্রাকার নয় দণ্ডাকার। নররূপী নন কিন্তু নরধর্মী, নির্দিষ্ট সময় অন্তর কলেবর ত্যাগ করেন, কায়াকল্প যোগীর মতো পুরাতন 'কায়া ত্যাগ করেন। তারপর স্নান পূর্ণিমায় কলসীর পর কলসীর জলে স্নান করে জ্বরে ভোগেন, দু'একদিন নয়, এক পক্ষকাল। তখনকার ভোগ-নৈবেদ্য আড়ম্বরবর্জিত সাধারণ, জ্বরে ভোগা রোগীর মতো। কিন্তু অন্যান্য সময় মহাপ্রভুর ভোগরাগ একজন পরমসুখী, অভিজাত ব্যক্তির মতো রাজসিক।

জগন্নাথের সঙ্গে ছাপ্পান্ন ভোগ কথাটি জড়িয়ে আছে। সাধারণের ধারণা, প্রতিদিন তাঁকে বলরামকে, ভগিনী সুভদ্রাকে ছাপ্পান্ন রকম সুস্বাদু খাবার নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করা হয়। কিন্তু 'ছাপ্পান্ন' বলতে ছাপ্পান্ন সংখ্যাকেই বোঝায় না। কারণ ভোগের তালিকা হিসেব করলে তা ছাপ্পান্নকে ছাপিয়ে যায়। ছাপ্পান্ন ভোগের তালিকা নিম্নরূপ :

১. জগন্নাথ বল্লভ, ২. কানিকা, ৩. ফেনা, ৪. নুনফেনী, ৫. ধনুশ্বরা, ৬. বড়-পুরী, ৭. সানপুরী, ৮. খরিকাসরা, ৯. বড়-নাড়ী, ১০. সান-নাড়ী, ১১. কাকরা, ১২. হংসকেলী, ১৩. চন্দ্রকান্তি, ১৪. পনশুয়া, ১৫. বড়া, ১৬. বড়ঝিলি, ১৭. সানঝিলি, ১৮. কাকাতুয়া-ঝিলি, ১৯. আরিবা, ২০. পাগ অরিষা, ২১. মরিচ-লাড্ডু, ২২. খিরিয়া, ২৩. মেন্টাশিঙ্গিয়া, ২৪. তিপুরী, ২৫. অরখফুল, ২৬. চাউলপুরী, ২৭. সরকুয়পী, ২৮. সরুচকুলি, ২৯. গজা, ৩০. খজা, ৩১. মগজনাড়ু, ৩২. ডালিম্ব (দন্তভাঙ্গা), ৩৩. নিমকি, ৩৪. সরভাজা, ৩৫. সরমণ্ডা, ৩৬. খোয়মণ্ডা, ৩৭. পারিজাতক, ৩৮. তামালু, ৩৯. মণ্ডিয়, ৪০. বল্লভকোরা, ৪১. অমৃতরসাবলী, ৪২. বড় খিড়িষা, ৪৩. সুয়ারী, ৪৪. ছানা মাণ্ডুয়, ৪৫. চড়েই-নদা, ৪৬. কড়ম্বা, ৪৭. সর, ৪৮. সাতপুরী, ৪৯. নারিকেল লাড্ডু, ৫০. হংস বল্লভ, ৫১. ছানাপিঠা, ৫২. সেবটিছিলি, ৫৩. মাঠপুলী, ৫৪. সরপাপড়ি, ৫৫. খন্তমন্তা, ৫৬. নাড়িয়াখুদি, ৫৭. এন্তুরী, ৫৮. পিঠাপুলি, ৫৯. শ্রীহস্তকোরা, ৬০. বুঁদিয়াখিরি, ৬১. মহাদেঈ, ৬২. সরকাকরা, ৬৩. গুড়খিরিয়া, ৬৪. মোহনভোগ, ৬৫. জেলামনি, ৬৬. খইকুর, ৬৭. কতাঁলপুলি, ৬৮. লক্ষ্মীবিলস, ৬৯. নুন-ঘুরমা, ৭০. চুলিয়া-চুপড়া, ৭১. বলি-বামন, ৭২. ছানাচকটা, ৭৩. অটকালি, ৭৫. চিতউপিঠা, ৭৫. ছুঁতিপত্র, ৭৬. পোড়াপিঠা, ৭৭. শেউ, ৭৮. অতরছমন্ডা, ৭৯.কইঁঠাপিঠা, ৮০. সরপনা, ৮১. মাখন, ৮২. খলিরুটি, ৮৩. মালপোয়া, ৮৪. রাধাবল্লভী, ৮৫. ফেনামুণ্ডা।

ওড়িয়া ভজনে প্রচিলিত আছে— 'ছাপ্পান্ন ব্যঞ্জন নানা জাতি, ভোগ লাগে দিবারাতি।'

বস্তুত এতসব ভোগ নিবেদনের একটা নির্দিষ্ট রীতি, আচার আছে যা মেনে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে সারাদিনে সাতবার উপাদেয় ভোগসামগ্রী নিবেদন করা হয়। শাস্ত্রীয় নিয়মে দাঁতমাজা, সুবাসিত জলে স্নান, প্রসাধনের পর ভোগগ্রহণ শুরু হয়।

দিনের প্রথম ভোগ— বালাভোগ বা বল্লভভোগ, সকাল ৮টায় অর্পণ করা হয়। এতে থাকে মুড়কি যাকে বল্লভও বলা হয়। বঙ্গের মুড়কির মতো নয়। প্রথমে ঘিয়ে খই ভাজা হয়, অপরদিকে গুড়ের সঙ্গে নারকেল কুচি দিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়, তার মধ্যে ঘিয়ে ভাজা মুড়কি খই দেওয়া হয়। নামানোর সময় দেওয়া হয় গোলমরিচ, লঙ্কা, বড়ো এলাচের গুঁড়ো ও কর্পূর। তৈরি হয় জগন্নাথ বল্লভ। এর সঙ্গে থাকে খই, সরপাপড়ি, মাখন, দধি, খোয়ামণ্ডা, বল্লভকোরা, খণ্ডমুণ্ডা, নড়িয়া-খুদি,

ঘষাজল এবং সময়ের ফল। বল্লভকোরা এক ধরনের নাড়ু, বঙ্গের গুড়ের নাড়ুর মতো। নারকেল কুরে গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়, তাপর ভিয়েন ঠিক হলে নামিয়ে ঘি, গোলমরিচ, লবঙ্গ, বড়ো এলাচের গুঁড়ো কর্পূর মিশিয়ে নাড়ু পাকানো হয়। একটি জায়ফলকে মাটির ভাঁড়ে ঘষে জলের সঙ্গে মেশানো হয়, এর সঙ্গে কর্পূর যোগ করা হয়, হয়ে গেল ঘষাজল জগন্নাথের পানীয়।

জলযোগের পর রাজভোগ যা সকাল ১০টায় নিবেদন করা হয়। ভোগের তালিকায় থাকে এন্ডুরী, খিচুড়ি (কর্মাবাই খিচুড়ি), আদাপা-চেলি, মাঠপুলি, হংসকেলি, হংসঝিলি, কাকুয়াঝিলি, চন্দ্রকান্তি, মিঠাকালিকা, শাক, আলুকদলি ভাজা, পিঠাপুলি, চাট-খিচুড়ি, মেন্তামুড়িয়া, বুন্দিয়াখিরি, মহাদেঈ প্রভৃতি আহার্য, কর্মাবাঈ খিচুড়ির সঙ্গে কর্মাবাঈ নামে এক ভক্তের আখ্যান জড়িয়ে আছে। তাই এহেন নাম। দশভাগ চালের সঙ্গে ছ' ভাগ গোটা কাঁচামুগ, সেইসঙ্গে আদা, লবণ, হিং দিয়ে জ্বাল দিয়ে আধসেদ্ধ হলেই ঘি দিয়ে নামানো হয়। অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে শাক অবশ্যই থাকা চাই। যতই রাজকীয় ভোগ দেওয়া হোক, প্রতিদিনের অন্নে সাধারণ শাকে মহাপ্রভুর বিশেষ প্রীতি। তবে, চাঁপানটে শাকেই প্রভুর সন্তোষ। কথিত, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী এই শাক রন্ধন করেন।

বেলা ১২টা নাগাদ দেওয়া হয় ছত্রভোগ। সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে এই ভোগের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিত বিভিন্ন মঠের ভোগ ও ছত্রভোগের অন্তর্ভুক্ত। এতে থাকে অন্ন, ডাল, মহুরা, বেসর, শাক তাম্বল, মধুরুচী, দহিকড়ি, শাকর, রাইতা, পিতা, কখারু সন্তোরা, গোটাবেগুন মরিচাপানি, গোটাকচু মরিচাপানি বলিবামন মুগ, খুদপিতা ফড়িশুকতা ইত্যাদি। অড়হর ডালে জিরা ভাজার গুঁড়ো, চিনি ও আদা মিশ্রিত করে সেদ্ধ করা হয়। মহুরা বলতে বোঝায় বেগুন, কচু, কাঁচকলা, দেশি আলু, খামআলু, লাল আলু, মিষ্টি কুমড়ো প্রভৃতি সবজির সঙ্গে জিরে, গোলমরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, বড়ো এলাচ, লবঙ্গ, ধনিয়া বেটে মিশিয়ে সেদ্ধ করা হয়। শেষে জিরে, মৌরি, সরষে, মেথির ফোড়ন ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

শাক অম্বল ব্যঞ্জনে শাক নেই; চালতা থেঁতো করে তার সঙ্গে চালবাটা, গুড়, সরষে বাটা, মৌরি বাটা এবং নারকেল কোরা দিয়ে সেদ্ধ করে শেষে সম্বরা ছড়িয়ে নামানো হয়। ভারি সুন্দর সব ব্যঞ্জনের নামও। যেমন মধুরুচী, আসলে পাকা তেঁতুলের মণ্ড করে গুড়, চালগুঁড়ো, নারকেলকোরা, মিষ্টি কুমড়ো লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে শেষে সম্বরা দেওয়া হয়।

এরপর দ্বিপ্রহরে ভোগ বা মধ্যাহ্ন ভোগ। বেলা ২টার সময় দেওয়া হয়। অনেক ভোজ্যসামগ্রী পরিবেশিত হয়। যেমন— বিরিবরা, ধউলা, মনোহর, সরপনা, সুবাসপখাল, আরিষা, পাগ-তারিষা, নুবিখুরমা, বড়িখিরিষা, মরিচপানি, বড়নাড়ি, সরা-কাররা, ফেনি, গজা, খজা, তিপুরী, সেবতীঝিলি, বড়পিঠা, তাটপিঠা, মরিচনাড়ু, মাটপুলি, ভজা, শাকরা, ছেনাপিঠা, ওরিয়া, গুড়খিরিকা, কাকরা, সরপুলি, ঝড়াইনদী জগন্নাথবল্লভ, মগজনাড়ু, লক্ষ্মীবিলাস, ঘৃতান্ন, পীতান্ন, পঞ্চামৃতখিরি। ভারি সুন্দর সুন্দর নামের এই সব ভোজ্যের মধ্যে সুবাস-পখাল আসলে সুবাসিত অন্ন। অন্ন সেদ্ধ হলে ফেন বাদ দিয়ে প্রথমে গরম অন্ন ঠাণ্ডাজলে ধুয়ে নেওয়া হয়, তাপর দু' ঘণ্টা ধরে গোলাপ, মল্লিকা, বেল, যুঁই এসব সুগন্ধি ফুল মিশ্রিত জলে রাখা হয়। এর সঙ্গে থাকে মরিচপানি ব্যঞ্জন, যা ঘি ও অন্যান্য মশলা দ্বারা প্রস্তুত কাঁচকলা, বেগুন, পটোলের সবজি।

আরিষা ও পাগ আরিষা— উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় কাঁচা কাঁচা চালের গুঁড়ো, গুড়, ঘি। অনেকটা মালপোয়ার মতো আকার ও স্বাদ। সরপুলি তৈরি করার পদ্ধতি হলো, বিউলি ডাল বেটে তার সঙ্গে লবণ, হিং, জিরের গুঁড়ো, আদাছেঁচা, গোটা গোলমরিচ, নারকেল কুচি, দুধের সর মিশিয়ে কলার পাতার উপর খুরির মতো প্রস্তুত করে ঘিয়ে ভেজে খণ্ডগুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিকাল চারটায় মহাপ্রভুর বিশ্রামের পর জিলিপি ভোগ।

সন্ধ্যা সাতটায় সন্ধ্যাধূপ বা সন্ধ্যা ভোগ। সন্ধ্যাকালীন এই ভোগে নিবেদিত হয় কলাই ডালের জেলামনি, মাঠপুলি, কলাইডালের কঅঁলপুলি, সুয়ারী, খাণ্ডুয়, দুধ ও ছানার রসাবলী টাকুয়া, দধিখাল, পারিজাতক, অমালু, শাকর, মরিচনাড়ু, খইচুর, হংসবল্লভ, আটার মালপুয়া, আটা ও কলাইডালের চড়াইনদাস, চুলিয়া পাখালা, চুপুরা পখালা, বাখালা।

রাত এগারোটায় রাত্রিভোগ বা শৃঙ্গার ভোগ। শেষে শয়নের সময় সুবাষিত জল, ডাব, তাম্বুল অপণ করা হয়।

শয়নের পূর্বে কবি জয়দেবের গীত গোবিন্দের, সঙ্গে দেবদাসীর নৃত্য পরিবেশন করা হতো, যা বর্তমানে বন্ধ আছে।

ভেবে দেখতে গেলে, মহাপ্রভু জগন্নাথ, প্রভু বলভদ্র ও মাতা সুভদ্রাকে ঘিরে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল আয়োজন যা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। অবশ্য মহাপ্রভু জগন্নাথের ছোটোখাটো কিছু নেই, তাঁর সবই বৃহৎ মাপের। তিনি নিজে মহাবাহু, বিশাল দুই পলকবিহীন চোখের আশ্চর্য চাউনি, সুবৃহৎ মন্দির ও মন্দির চত্বর, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাকশালা। হবে নাই-বা কেন, প্রভু বদ্রিবিশালে স্নান করেন, দ্বারকায় পোশাক পরেন, রামেশ্বরে বিশ্রাম করেন, তার ভোজনের জন্য শ্রীক্ষেত্রকে নির্বাচিত করেছেন।

তবে এই সব ভোজনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বা বিশেষ কিছু রীতিনীতি কখনো কখনো পালিত হয়। স্নানযাত্রার পরে প্রভুর জ্বরের কথা আগেই বলা হয়েছে, তখনকার ভোগ-নৈবেদ্য জ্বরাক্রান্ত রোগীর মতোই। বিভিন্ন যাত্রায় ভোগ নৈবেদ্যর কিছু পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ রথযাত্রায়, রথের উপর যে ভোগ নিবেদিত হয় তা অন্য সময় হয় না। যেমন পুনর্যাত্রার পর শ্রীমন্দিরের সামনে রথারূঢ় জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার উদ্দেশে অধরপনা ভোগ। তিন শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশে তিনটি করে মাটির ভাণ্ডে অধরপনা ভোগ প্রদান করা হয়। ভাণ্ডগুলির উচ্চতা শ্রীবিগ্রহের পাদদেশ থেকে অধর অবধি। তাই এই অধরপনা নাম।

বর্তমানে টিভি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই অপূর্ব ভোগ নিবেদন সরাসরি দর্শনের সৌভাগ্য সকলের হয়। দেড়মন চিনি, চার হাঁড়ি দুধের সর, বাহান্ন কলসীর জলের সঙ্গে বড়ো এলাচ-গোলমরিচের গুঁড়োর মিশ্রণে এক একটি ভাণ্ডের পনা প্রস্তুত হয়। ভোগ নিবেদনের পর প্রত্যেকটি ভাণ্ড ভেঙে ফেলা হয়। রথের উপর পাটাতনে গড়িয়ে যায় পনা। দুদিন ধরে চলে ই অধরপনা ভোগ অর্পণ, অলক্ষ্যে থেকে সব দেব-দেবী এই অধরপনা ভোগের প্রসাদ নেবার প্রত্যাশায় উপস্থিত হন। জগতের শান্তি হয়, আমরা দূর থেকে সচ্চিদানন্দের এই লীলা চাক্ষুষ করে চমৎকৃত হই। □

খেলার মাঠে উঠে আসছে মেয়েরা, তারাই নবতন্ত্রের রচয়িতা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

সত্যের খাতিরে একথা মানতেই হবে যে, গড়পড়তা কাজের বাইরে মেয়েদের অন্য যেকোনো কাজ, অনুশীলন, এমনকী কিছু একটা আলাদা ভাবাটাও যেন বেমানান। বিশেষত গরিব, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েও যারা মধ্যবিত্ত মানসিকতার অধিকারী, সেই সব বাড়ির মেয়েদের খুব সমস্যা। প্রথম সমস্যা, অধিকাংশ সময়েই পারিবারিক বোধ এটাই বলে যে, তুমি কোনো ঝুঁকি নিও না। লেখাপড়া করো, ঝুঁকিহীন নির্ঝঞ্ঝাট চাকরি বা উপার্জন এবং যদি সময় থাকতে সে পথে ফল না ফলে— ভালো পাত্র দেখে বিয়ে করো। অপ্রিয় হলেও এটাই আমাদের দেশের অধিকাংশ বাড়িতে মেয়েদের দেখার এবং তাদেরও দেখতে শেখার খুব সাধারণ পথ।

আজ ক'বছর ধরে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো, তা হলো— সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবে খুব কম হলেও সেই তথাকথিত আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা পরিবারের মেয়েরাই মাঠ কাঁপাচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়া জগতের বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, খেলার জন্য জুতো কেনার সামর্থ্য ছিল না যে পরিবারের, সেই পরিবারের মেয়েটাই অদম্য জেদ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমকে সম্বল করে, অকল্পনীয় সামাজিক ও পারিবারিক বাধা-সমালোচনার হার্ডল টপকে অবিশ্রান্তভাবে দৌড়াচ্ছে। খালি পা, না আছে ঠিকঠাক ডায়েট, না আছে কোচ, না আছে বাড়ির সবার স্বচ্ছন্দ অনুপ্রেরণা। তবুও সেই সব মীরাবাঈ বা মেরি কম বা সাম্প্রতিক এশিয়াডে ১০০ মিটার হার্ডলসে সোনা পাওয়া জ্যোতি, খেলাধুলায় সাফল্য অর্জনের পর বলে, 'আমরা জিততে চাই'।

ওরা কি শুধুমাত্র খেলাধুলায় যোগদান করল? সাফল্য পেল? পদক জিতল? ওরা সবাই ওদের মতো বুঝিয়ে দিল যে, শুরুতে এবং অনেকটা পথ পর্যন্ত সুযোগ দাও না দাও আমরা আমাদের স্বপ্নপূরণের জেদে হাই লিডস জুতো পরে ফেলেছি। সেই প্রবল জেদেই পাড়ার মাঠে খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে অলিম্পিক পৌঁছায় হিমা দাস। নানা সপ্রতিভতায় জিমনাস্টিক করে দীপা কর্মকার। দ্যুতি চাঁদ বেড়া ভেঙে দৌড়ায়। উৎকর্ষের তুঙ্গে উঠে হাই জাম্প দিয়ে সোনা ছিনিয়ে আনে পূজা সিংহ। রূপাল চৌধুরী (২০২৫ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৪০০ মিটার দৌড়ে রুপো) থেকে পূজা (তাইওয়ান অ্যাথলেটিক্স ওপেন, ২০২৫-এ ১৫০০ মিটার দৌড়ে রুপো) বা নন্দিনী আগাসারা (২০২৫ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে হেপ্টাথলনে সোনা)— ক্রীড়াবিদ হিসেবে ভারতীয় মেয়েদের সাম্প্রতিক সাফল্য রীতিমতো নজরকাড়া। ২০২৫ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ৪-৪০০ মিটার রিলে রেসেও ভারতীয় মেয়েদের দলটি স্বর্ণপদক জিতল।

সেই তথাকথিত পিছিয়ে থাকা বাড়ির মেয়েদের হাত ধরেই খেলাধুলায় এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। ২০১৬-১৭-র পর থেকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। আমাদের মেয়েরা প্রাণমন ঢেলে মাঠে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে বলেই অধিকাংশ মানুষ আর প্রকাশ্যে বলতে পারছে না— ধুস, মেয়েদের খেলাধুলো কী

দরকার! তারা বলছে, কিন্তু মনে মনে। নিজের বাড়ির মেয়েটাকে রানিং শু দিয়ে তারা বলছে না— দৌড়াতে যাও। অন্য বাড়ির মেয়ে দৌড়ালে বা খেলাধুলোয় অংশ নিলে এ মেয়ের কিচ্ছু হবে না বলে বিচারক বা জ্যোতিষের ভূমিকাতে অন্তত আসছে না। এত দিন-রাত পরিশ্রম ও অনুশীলন করে মেয়েগুলো পদক আনছে, আন্তর্জাতিক মাঠে ভারতের পদক্ষেপ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করছে, তাতে নিঃশব্দে বদলাচ্ছে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্র। প্রতি মুহূর্তে মেয়েরা প্রমাণ করছে যে, ছেলেদের থেকে তারা কোনো অংশে কম নয়। সমভূমি তারা চায় না। প্রতিযোগিতায় তারা যথেষ্ট দক্ষ। লিঙ্গবৈষম্য মুছতে প্রথম যদি কোনো মঞ্চ হয়, তবে তা হলো খেলার মাঠ। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, যেদেশে যত বেশি খেলার অবকাশ, খেলার মাঠ যেদেশে যত উন্মুক্ত, সেদেশ সামাজিক উদারতায়, জেন্ডার নিউট্রাল চেতনায় তত এগিয়ে। নাগরিক সচেতনতায়েও সেই সব দেশ যথেষ্ট এগিয়ে। খেলার মাঠে মেয়েদের অংশগ্রহণ যত বাড়বে, সামাজিক সুরক্ষা, নাগরিক সচেতনতা, লিঙ্গবৈষম্যহীনতার সিংহদ্বার খুলবে।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্তও মেয়েদের খেলা মানে ছিল একপ্রকার বিলাসিতা। তাই সাধারণত দেখা গিয়েছে যে, মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের মেয়েদেরই রয়েছে খেলার জগতে প্রবেশাধিকার। সানিয়া মির্জা, পিভি সিন্ধু বা সাইনা নেহওয়ালরা নিঃসন্দেহে সোনার মেয়ে। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অসুবিধা, দারিদ্র্য, অস্বচ্ছলতার সঙ্গে প্রতিদিন লড়তে লড়তে তাঁরা জেতেননি। আর ঠিক এই প্রসঙ্গটিতেই এই নিবন্ধের অবতারণা। সানিয়া, সাইনাদের মতো ক্রীড়াবিদরা কেবলমাত্রই খেলার মাঠে জিতেছেন। তাঁরা দেশকে অসংখ্য পুরস্কার ও পদক এনে দিয়েছেন। কিন্তু ভারোত্তোলক মীরাবাঈ চানু, কিংবা ২০২৩ এশিয়াডে তিরন্দাজিতে স্বর্ণপদকজয়ী জ্যোতি সুরেখা বেন্নম, বা ২০২৫ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ১০০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণপদকজয়ী অ্যাথলিট জ্যোতি ইয়ারাজি দেশকে সম্মান এনে দেওয়ার সঙ্গে ভারতীয় মেয়েদের মনে জাগ্রত করলেন এক অদম্য আত্মবিশ্বাসের না করার বোধ।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জ্যোতির মতো মেয়েদের কেউ স্বপ্ন দেখায়নি। ওরা নিজেরাই স্বপ্ন বুনেছে। ২০২৩ এশিয়ান গেমসের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্টভাবে দেখলে চোখে পড়বে, যে ক'জন ভারতমায়ের কন্যা হরিণের মতো দৌড়ে, চিতার মতো ক্ষিপ্রতায়, সিংহের মতো লড়ে মাঠজুড়ে তাঁদের দাপট দেখাল, তাদের সবার মধ্যেই একটা সাধারণ মিল। সেই সব বাড়ির মেয়ে, যাঁদের বাবার উপার্জন সামান্য, তাঁদের দাদারা হয়তো বোনকে বলেছিল যে, খেলাধুলোটা ছাড়িস না। দাদা বা অভিভাবক-স্থানীয়দের কথা শুনেই হয়তো তাঁরা খেলার জগৎ ছাড়েননি। একটি মেয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের সঙ্গে যখন লড়াই হয়, তখন তা বড়ো অসম লড়াই। পরিবারের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই একটা মেয়ের জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়।

একটা উদাহরণই যথেষ্ট। অন্নু রানি। মীরাটের গ্রামের মেয়ে। তাঁর দাদা একদিন দেখেন যে, তাঁর বোন আখের জমিতে ঘুরতে ঘুরতে আখগাছ উপড়ে বেশ জোরে নিক্ষেপ করছে। কী অসাধারণ জোর! নির্দিষ্ট দিকে তার লক্ষ্য। ওখান থেকেই অন্নুর জ্যাভলিন থ্রোয়ে হাতেখড়ি। কিন্তু কে জোগাবে সাহস, সমর্থন আর কেই বা করবে অর্থসাহায্য? খেলা চালিয়ে যেতে দৃঢ়চেতা হয়ে ওঠে অন্নু। বাবা প্রথমেই বেঁকে বসলেন। কিন্তু নিঃশব্দে সমর্থন দিয়ে গেলেন দাদা। তিনিও ছিলেন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়। খেলা ছাড়লেন তিনি। সেই অর্থ বোনের জন্য ব্যয় করা শুরু হলো। বোনের খেলার সরঞ্জাম থেকে তাকে নিয়মিত স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার মাঠে পৌঁছানো। অন্নুর দাদা যেন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠলেন 'ফাইট কোনি ফাইট'-এর ক্ষিতীশ সিংহ বা ক্ষিতিদা। খেলতে গিয়ে অন্নু তার লিগামেন্টে চোট পেল। খেলোয়াড়দের অলংকার হলো ওসব চোট। ২০২৩ এশিয়াডে লক্ষ্য স্থির রেখে অনেক গজ দূরে বর্শা নিক্ষেপ করল, জিতল স্বর্ণপদক। যেই না অন্নু সোনা আনল, অমনি পাড়া, গ্রাম, পরিবার সবার মালুম হলো— না! মেয়েটা কিছু একটা করল। ভাগ্যিস সোনা আনল। যতক্ষণ না পারফরম্যান্সের জোরে মেয়েগুলো সমালোচকদের নাকে-মুখে ঝামা না ঘষে, ততক্ষণ এই মেয়েগুলোর পরিশ্রম আর অসম লড়াইটা সমাজের চোখে যেন উড়ুক্কু মাছের আকাশে ওড়ার শখের মতোই ঠেকে! এশিয়ান গেমসে না থেমে অন্নু ইতিহাস গড়লেন প্যারিস অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে প্রথম ভারতীয় মহিলা প্রতিযোগী হিসেবে।

ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজ মেয়েদের ব্যাপারে বড্ড জাজমেন্টাল। যে রাঁধে, তাঁকে খেলার মাঠে যেতে দিলে সেও কুস্তিগির বা পালোয়ান হয়ে উঠতে পারে। চার দেওয়ালের মধ্যেই মেয়েদের সীমাবদ্ধ ভূমিকা দেখতে চায় সমাজের একাংশ।

আমাদের দেশে খেলাধুলোকে দীর্ঘ সময় খেলাচ্ছলেই দেখা হতো। আছে সবটাই, কিন্তু বেশিরভাগটাই খাতায়-কলমে। স্টেডিয়াম আছে, কিন্তু ১০ কিলোমিটার রাস্তা আর বিশ্বের বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে একটা মেয়ে যে আসবে, তার উপায় কোথায়? ১৯৫৪ সালে 'অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টস্' গঠন করা হলেও তা স্পোর্টস্ প্রোমোশনে সেভাবে কাজে আসেনি। খেলাধুলোর উন্নতির লক্ষ্যে ২০০১ সালে 'ন্যাশনাল স্পোর্টস্ পলিসি' বা 'খেলনীতি'

প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ। ভারতীয় স্পোর্টস্ বা ক্রীড়াক্ষেত্র সেই সময় থেকে যেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শ্বাস নিতে শুরু করল। অর্থাৎ খেলুক সবাই। কার ছেলে, কোন বাড়ির মেয়ে এই বাছবিচারের প্রয়োজন নেই। সেই থেকে খেলার জগৎ রূপান্তরিত হচ্ছে ক্রমশ।

২০১৮ সালে ভারত সরকার গৃহীত 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্প যে প্রকৃত অর্থেই গেম চেঞ্জার হয়ে খেলা ঘুরিয়ে দিল যা কেন্দ্রীয় সরকারের চরম বিরোধীরাও অস্বীকার করতে পারবে না। খেলাধুলোর মানসিকতার ল্যান্ডস্কেপ বা প্রেক্ষাপটই গেল বদলে। স্কুল থেকে লোকাল কমিউনিটি সর্বত্র চলতে লাগল ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম। প্রতিভা, ইচ্ছে, আগ্রহগুলো যেন সামাজিক, পারিবারিক তাচ্ছিল্য, অসহযোগিতায় হারিয়ে না যায় সে বিষয়ে নজর দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই লক্ষ্যে স্থির ক্ষিতিদার ভূমিকায় যেন অবতীর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করল 'টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম'। এটি একপ্রকার হাই-পারফরম্যান্স সাপোর্ট সিস্টেম। ১০-১২ বছর বয়সি প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং অলিম্পিকের উদ্দেশ্যে তাদের তৈরি করা। উদাহরণ হরিয়ানা। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ক্রীড়াক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি এই রাজ্য জুড়ে হয়েছে বিস্তৃত ও বিকশিত। আজ ভারতের স্পোর্টস্ হাব হয়ে উঠেছে হরিয়ানা।

বর্তমানে ভারত জুড়ে খেলাধুলোর যে ট্রেন্ড তৈরি হয়েছে, সেটি পর্যালোচনা করলে আমরা খুশি, অখুশি— দুই-ই হবো। খুশি হওয়ার কারণ হলো দূর পাহাড়ের মেয়েটা যে কাঠ বইছিল, সে আজ বিশ্ববরেণ্য ভারোত্তোলক। যে মেয়েটা ভেবেছিল খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কে তাঁর পাশে দাঁড়াবে, তাঁকে আজ সারা দেশ বলছে 'খেলো'। সুসময়ে ও দুঃসময়ে অনেক মেকি, জ্ঞানপাপী, সমালোচনাকারী আনাচে কানাচে গজায়। তাদের আবির্ভাবে বোঝা যায় যে, মেয়েগুলো সত্যিই হাওয়া বদলে দিচ্ছে।

অখুশি হওয়ার কারণ হলো, ২০১৫-'২৩ পর্যন্ত ট্রেন্ড পর্যালোচনা করলে চোখে পড়বে লিঙ্গবৈষম্য। ২০১৫-'২৩-এর মধ্যে মেয়েদের স্পোর্টস্ ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৭ শতাংশ। অথচ, ছেলেদের হার কিন্তু এই সময়ে কমেছে। ৭০ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৬৩ শতাংশ। কিন্তু স্পোর্টস ফান্ডিঙের অঙ্ক সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেক্ষেত্রে ছেলেদের জন্য রয়েছে মোট বরাদ্দের ৭৫ শতাংশ। ট্রেনিং ফেসিলিটিতেও ছেলেরা ৩৬ শতাংশ এগিয়ে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খুব স্বাভাবিকভাবেই মেয়েরা ৩২ শতাংশ পিছিয়ে। প্রাইজ মানির বৈষম্যও বেশ আশ্চর্যজনক! এক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য ৪০ শতাংশ কম বরাদ্দ। এটা ঠিক যে, ভারতীয় স্পোর্টসে এখনও একজন সাধারণ বাড়ির মেয়ের যোগদান বা ভবিষ্যৎ বড্ড অনিশ্চিত। সফল কেরিয়ারের মাধ্যমে আগামীদিনের স্বচ্ছল জীবনযাত্রার গ্যারান্টিও তাঁদের অনেকের থাকে না। আর্থিক বা পারিবারিক কোনো সমস্যা বা অঘটন যদি হয়, সবার আগে ক্রীড়াবিদ মেয়েটির কাছে বাড়ি থেকে খেলা ছাড়ার নোটিশ আসবে। খেলাধুলোর প্রতিভা অন্বেষণ, সেই ট্যালেন্টগুলিকে তুলে আনা থেকে শুরু করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার এবং এগিয়ে দেওয়ার মানসিকতা সমাজের অধিকাংশের নেই। ফেসবুক বা ইউটিউবের দৌলতে একজন লাস্যময়ী তরুণী ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে। কোনো প্রতিভা ছাড়াই সেই জনপ্রিয়তা অর্জন করা হয়তো সম্ভব। এর বিপ্রতীপে সব বাধাবিপদ পেরিয়ে অত্যন্ত সাধারণ বা প্রান্তিক কোনো পরিবার থেকে উঠে এসে ক্রীড়াবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একটি মেয়ের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাতে যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয় আমাদের সমাজ।

ভারতীয় অ্যাথলিট শৈলী সিংহের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ২০২৪ সিক্সথ ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স কন্টিনেন্টাল ট্যুরে লং জাম্পে দু'টি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন শৈলী। একই রকম সম্ভাবনা রয়েছে পূর্বা হিতেশ, রাভাদা কুসুম, রুচিথাদের মধ্যে। কেবল কি এরাই? এরা প্রতীকী নাম। ২০২৫ হিমাচল কেশরী কুস্তিগির হয়েছেন কৃতিকা। বৃহত্তর প্রতিযোগিতার অঙ্গনে যাওয়ার জন্য সে এখন তৈরি। খেলার মাঠ চরিত্র গঠন করে, চিত্ত সুন্দর করে।

পশ্চিমবঙ্গে তো রাজনৈতিক খেলা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। ক্রীড়া জগতের মর্যাদা যেন আজ ভুলতে বসেছে পশ্চিমবঙ্গ। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি ক্রীড়াক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য স্বাভাবিকভাবেই উত্তর-পূর্ব ভারতের মেয়েদের শারীরিক শক্তি, মনের জোর অনেকটাই বেশি। উত্তর-পূর্বের অনেকগুলি রাজ্যে সমাজও মাতৃতান্ত্রিক। লিঙ্গবৈষম্য অনেক কম। এই সমাজ থেকে উঠে আসা মেয়েরা একটু সুযোগ পেলেই মীরাবাঈ চানু বা মেরি কম হয়ে উঠতে পারে। ২০২৩ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল যখন শ্রীলঙ্কাকে ১৯ রানে পরাজিত করে সোনার মুকুট পড়ল, তখন গোটা ভারত এটা বিশ্বাস করল যে দলগতভাবে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পেলে, মেয়েরাও ছেলেদের মতোই খেলে এবং জেতে। ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজ মেয়েদের ব্যাপারে বড্ড জাজমেন্টাল। যে রাঁধে, তাঁকে খেলার মাঠে যেতে দিলে সেও কুস্তিগির বা পালোয়ান হয়ে উঠতে পারে। চার দেওয়ালের মধ্যেই মেয়েদের সীমাবদ্ধ ভূমিকা দেখতে চায় সমাজের একাংশ। এই কূপমণ্ডূকরা চায় চিরকাল মেয়েরা; এদের সংকীর্ণ মানসিকতা, এদের পক্ষ থেকে নানা আঘাত এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও জ্যোতিরা খেলার মাঠে গণতন্ত্র আনে। বৈষম্য ঘুচিয়ে লিঙ্গসাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ভারতীয় সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনে ওরাই। এরা সবাই হলো ক্রীড়া সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক মতি নন্দী রচিত 'কোনি' উপন্যাসের কোনি। কোনিও যেমন ক্ষিতিদার কণ্ঠে শুনেছিল— 'ফাইট কোনি ফাইট', এরাও অর্থাভাব এবং অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে অনবরত কান পেতে শোনে— 'ফাইট, ফাইট'। এই বাক্যের সঙ্গেই কোনিদের আত্মীয়তা। কোনিরাই নবতন্ত্রের রচয়িতা। □

মহেশতলার ঘটনা রাজ্য সরকারের প্ল্যান-এ না প্ল্যান-বি?

বিশ্বপ্রিয় দাস

পুলিশের লাঞ্ছনা আর কত দেখতে হবে? সে পালিয়ে বাঁচা থেকে টেবিলের তলায় লুকানো। আর উর্দি ফেলে দিয়ে পাশের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা। সবই দেখতে হয় আমাদের। এক বীরপুঙ্গব আবার পুলিশের মা-মাসি উদ্ধার করেও পার পেয়ে যায়। রাজ্যে ভোটব্যাংকের রাজনীতি পুলিশকে এত নীচে নামিয়ে দিয়েছে, যেখানে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই চিন্তিত তাঁরা। এর কারণ তাঁরা শাসক দলের এতটাই পদলেহনকারী হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে ফেলেছেন, তাই সাধারণ মানুষের কাছে এখন তাঁরা অশ্রদ্ধার পাত্র। যারা নিরাপত্তা দেবে, তাঁরাই যখন নিজেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, তখন কার কাছে সাধারণ মানুষ যাবেন সুবিচার চাইতে? পুলিশ এখন পক্ষপাত দুষ্ট, তাঁরা চলেন শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে।

সম্প্রতি মহেশতলার ঘটনায় যারা প্রকৃত দোষী, যারা পুলিশের ডিসিপিকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল, তাদের কতজনকে পুলিশ আটক করেছে? আটক করেছে এমন কয়েকজনকে, ঠিক যেমনটা চেয়েছিল তাঁদের প্রভুরা। আটক হবার পরদিন, শাসক দলের সাংবাদিক কুলশিরোমণি মুখপাত্র প্রমাণ সহযোগে সেদিনের ঘটনায় আরএসএস-এর যোগ খুঁজে পেলেন এবং সেকথা বললেন সাংবাদিকদের। এমনকী তাঁদের কাছ থেকে বিস্ফোরক পাওয়া গেছে বলে দাবিও করলেন। ডিসিপি'র মাথা ফেরে সেলাই করতে হয়েছে, আর সেই রক্ত দিয়ে শাসক দলের এই প্ল্যানকে সফল্যমণ্ডিত করা, সম্মান কি বাড়ালো পুলিশের? সম্প্রতি পুলিশের রিপোর্টে সামশেরগঞ্জ কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া বহিরাগত তত্ত্ব, বিএসএফ-এর টাকা দিয়ে ঢিল ছোঁড়ানোর গল্প মিথ্যে প্রমাণ হয়েছে। আর সবজান্তা কিছু মুখপাত্র নাচানাচি করছেন, আর সরকারের গুণগান গেয়ে চলেছেন হাজারো মিথ্যে বলে।

মহেশতলায় এক ফল বিক্রেতাকে নাকি বসতে দেওয়া হয়নি, এই অছিলায় গণ্ডগোল শুরু। এরপর যা ঘটেছে, তা সবাই দেখেছে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে। এক সময়ে দেখা গেছে লুঙ্গি পরা একজন এসে তুলসী মণ্ডপ ভাঙছে। সেটা দেখেই ওখানে থাকা সেই সব হিন্দু রুখে দাঁড়ায়। তাঁরা অনেকদিন আগে মন্দিরটি তৈরি করেছেন, রক্ষাও করছেন। তাঁরা রুখে দাঁড়ালে ফলওয়ালার পক্ষ নিয়ে একদল জেহাদি চড়াও হয় মন্দির রক্ষা করতে থাকা হিন্দুদের ওপর। পুলিশ পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পরে বিশাল বাহিনী এসে রক্ষা করে তাঁদের। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে নামাতে হয় পুলিশের বিশেষ বাহিনীকে। থানা কাছে থাকা সত্ত্বেও এমন ঘটনা দেখে অবাক স্থানীয় মানুষ।

তাঁদের দাবি, ওখানে স্থানীয় কেউই ছিল না। সবাই বাইরের। আর এটা সম্পূর্ণটাই শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দল। মন্দির উপলক্ষ্য মাত্র। ওখানে স্থানীয় একটি সূত্র বলছে, বাজারের দখল নিয়ে বিধায়ক গোষ্ঠী এবং তাঁর বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব অনেক দিনের। এটাই তার বহিঃপ্রকাশ। যদি এখানে একটা ঝামেলা পাকিয়ে দেওয়া যায়, আর সেটায় যদি সাম্প্রদায়িকতার রং লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ভোটের আগে কিছু হলেও এই এলাকায় বিরোধীদের দাপট কমানো যাবে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ এখানে সরকারি ইট ভাটা চলত গঙ্গার ধারে। এক সময়ে ভালোই চলত। পরে সেটি অনেকটা পরিত্যক্ত চেহারা নেয়। সেখানে দুষ্কৃতীদের আড্ডা বাড়তে থাকে। বহিরাগতদের ভিড় সবসময়ে লেগেই থাকে। গঙ্গার ধারে হওয়ায় পালিয়ে যাওয়াও খুব সুবিধের। অন্যদিকে রেল স্টেশনও আছে। ফলে দুষ্কৃতীরা খুব সহজেই আসে আর যায়। ভোট যতই এগোবে, ততই এই আনাগোনা বাড়বে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষ। সন্ধ্যের পর এলাকার মানুষ খুব একটা প্রয়োজন না পড়লে ওই রাস্তায় যান না। ওখানে কোনো আইনের শাসন চলে না। এলাকায় শাসক দলের মদতে এক শ্রেণীর দাদা তৈরি হয়েছে। তারাই এলাকার দখল নিয়ে মাঝে মাঝেই ঝগড়ায় মেতে ওঠে। এখন মুসলমান ভোটব্যাংক, বিশেষ করে এই মহেশতলা এলাকায় অনেকটাই শাসক দলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। হয়তো সেই কারণে এখানে একটা ঝামেলা বাঁধিয়ে, সেই ভোটব্যাংকের দিকটা ঘোরাতে চাইছে শাসক দল। এমনটাই মত এখানকার স্থানীয় মানুষজনের।

এক সময়ে এইসব এলাকা বামপন্থীদের শক্তঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল। অনেক হার্মাদ ছিল সেই সময়। রাজনৈতিক পালাবদল হলে তাদের কিছু শাসক দলে চলে আসে রং বদল করে। আর এলাকা দখলের জন্য নানা রকম কৌশলের শুরু সেই দিন থেকেই। এদের দাপটে বামেরাও হাওয়া হয়ে যায়।

রাজ্য সরকারের প্ল্যান-এ বা প্ল্যান বি যাই হোক না কেন, সামশেরগঞ্জ অথবা মালদহ বা মুর্শিদাবাদ হতে দেবেন না এলাকার মানুষ। সে যতরকম প্ল্যান হোক না কেন, তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর প্রতিরোধ করবেন। এমনটাই মত তাঁদের। তবে তুলসীমণ্ডপের অবমাননা মেনে নিতে পারছেন না এলাকার হিন্দুরা। □

নবাঙ্কুর

অ্যাকোরিয়ামের মাছ

তিন্নি এখন একা। এখন তার গরমের ছুটি চলছে। বাবা- মা দুজনেই গেছেন অফিসে। এটা নতুন নয়। তিন্নি যখন থেকে একটু বুঝতে শিখেছে তখনই যে অনুভব করেছে সে একা।

তার সকালে স্কুল। তখন বাবা-মা বাড়ি থাকেন। কিন্তু তখন তো তিন্নিকে স্কুলে যেতে হয়। স্কুল থেকে যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন শিখাপিসি ছাড়া আর কেউ থাকে না।

তিন্নি দেখেছে স্কুলে তার বন্ধুদের বাবা কিংবা মা স্কুল গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিন্নির জন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকে না। তখন ভীষণ কান্না পায় তার। বাবা-মাকে একথা বলেছে তিন্নি। তারা বলেছেন, ওই সময় আমরা তো অফিসে থাকি। তখনই তিন্নি বুঝে গেছে, তার জীবন একা।

শিখাপিসি তিন্নিকে খেতে দেয়। অনেকদিন সে আধপেটা খেয়ে ওঠে। পাড়ায় তার কোনো বন্ধু নেই। মা-বাবা বলেছেন, এখানকার লোক তেমন সুবিধের নয়। ছেলে-মেয়েরাও তেমন ভালো নয়। তুমি এদের সঙ্গে মিশবে না।

তিন্নি ঘরে বন্দি থাকে। তাদের জানালার উলটো দিকে একটা পার্ক আছে। বিকেল হলে মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসে। কিন্তু তাকে কে নিয়ে যাবে? তিন্নি শিখাপিসিকে বলেছে। শিখাপিসি বলেছে— ওবে বাবা! ও কাজ আমি করতে পারি? তুমি বাবা-মায়ের থিকা পেরমেশন নিয়ে নাও। তাহলে আমি রোজ বিকেলে তোমাকে পার্কে নিয়া যাবো।

তিন্নি জানে তার বাবা-মা অনুমতি দেবেন না। মোবাইল ফোন তার ভালো লাগে না। এবার সে ধীরে ধীরে অ্যাকোরিয়ামের কাছে গিয়ে বসলো। আর তখনই রেড মলি বলে উঠল— তিন্নি, তোমার মা এই ছোট্টো বাক্সটায় আমাদের বন্দি করে রেখেছে। এইটুকু জায়গায় আমরা থাকতে পারি? আমাদের জায়গা তো সমুদ্র।

তিন্নি বলে, তোমাদের মতো আমিও এই বাড়িতে বন্দি। আমি কী করতে পারি বলো?

ব্ল্যাক মলি বলল, তুমি আমাদের মুক্তি দিতে পারো।

— কীভাবে? তিন্নি জিজ্ঞেস করল।

— আমাদের ড্রেনের মুখে ছেড়ে দেবে।

—আমরা ঠিক সমুদ্রে চলে যাবো। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। কী মজা! গোল্ডফিশ বলল।

তিন্নি কিছু সময় ভাবলো। তারপর সে এ এক-একটা মাছ জাল দিয়ে তুলে জল ভর্তি কাচের গেলাসে করে নিয়ে গিয়ে বাথরুমের জল যাবার মুখে ছেড়ে দিল। তারপর এক বালতি জল ঢেলে দিল।

শিখাপিসি তখন ঘুমুচ্ছে। তিন্নি জানে, মা তাকে বকবে। হয়তো মারবেও। তবু তার আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে মাছগুলো এখন নদী পার করে মনের আনন্দে সমুদ্রের দিকে চলেছে।

দেবদাস কুণ্ডু

জাতীয় উদ্যান

দুধওয়া

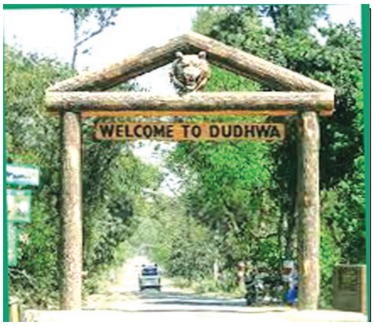

দুধওয়া জাতীয় উদ্যান উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায় নেপাল সীমান্তে অবস্থিত। ১৯৭৭ সালে এটিকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। উদ্যানটি ৬১৬ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত। এরমধ্যে ৪৯০ বর্গকিলোমিটার মূল অঞ্চল এবং ১২৪ বর্গকিলোমিটার বাফার অঞ্চল রয়েছে। এই উদ্যানে রয়েছে সবুজ শালবন, জলাভূমি ও তৃণভূমি। এখানে ৪৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ১০ প্রজাতির উভচর, ৩৭ রকমের প্রজাপতি এবং ৪৪৯ প্রজাতির পাখির বসবাস। বন্য প্রাণীর মধ্যে রছেছে বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, হিস্পিড খরগোশ, জলাভূমির হরিণ, মেছো বেড়াল, এক-শৃঙ্গযুক্ত গণ্ডার। এই মনোমুগ্ধকর উদ্যানে বন্যপ্রাণীপ্রেমী ও প্রকৃতিপ্রেমীদের মনের মতো সবকিছুই রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭৩

संख्यापाठः

२१-২১- एकविंशतिः। २२-২২-द्वाविंशतिः। २३-২৩ -त्रयोविंशतिः। २४-২৪-चतुर्विंशतिः। २५ - ২৫ - पञ्चविंशतिः। २६-২৬ -षडविंशतिः। २७-২৭-सप्तविंशतिः। २८-২৮-अष्टाविंशतिः। २९-২৯ नवविंशतिः। ३०-৩০ - त्रिंशत्।

৩১-३१- एकत्रिंशत्। ৩২-३२-द्वात्रिंशत्। ৩৩-३३-त्रयत्रिंशत्। ৩৪-३४-चतुस्त्रिंशत्। ৩৫-३५- पञ्चत्रिंशत्। ৩৬-३६-षटत्रिंशत्। ৩৭-३७-सप्तत्रिंशत्। ৩৮-३८- अष्टत्रिंशत्। ৩৯- ३९-नवत्रिंशत्। ৪০-४०-चत्वारिंशत्।

ভালো কথা

হনুমানের বুদ্ধি

আমাদের গ্রামে হনুমান নেই। তবে মাঝে মাঝে চার-পাঁচটি কোথা থেকে যেন আসে, আবার চলেও যায়। ওরা কোনো উৎপাত করে না। কাউকে কামড়ায়ও না। সবার বাড়িতেই যায়। রুটি ,বিস্কুট, ছোলাভাজা, শশা যে যা পারে তাই দেয়। কদিন আগে আবার চারটে হনুমান এসেছে। সারা পাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন আমাদের বাড়ি থেকে ওরা আমাদের পাশে সুকুদের বাড়ি গেছে। সুকুর ঠাকুমা খুব কিপটে স্বভাবের। সবাই বলে মনটাও ভালো নয়। হনুমান চারটি ওদের বাড়ি যেতেই সুকুর ঠাকুমা চারটে আম হনুমানদের দিকে গড়িয়ে দিয়েছে। আমরা ভাবছিলাম কী ব্যাপার, সুকুর ঠাকুমার মনটা কি ভালো হয়ে গেল নাকি? চারটে হনুমানই আমের খোসা ছাড়িয়ে কী যেন ভালো করে দেখল। তারপর ওদিক-ওদিক দেখে হঠাৎ সুকুর ঠাকুমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই আমগুলো খোসাসুদ্ধু ঠাকুমার মুখে আচ্ছা করে ঘষে দিয়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল। সুকুর ঠাকুমা তো প্রাণভয়ে চিৎকার করছে। বাবা আর আমি দৌড়ে ছুটে গেলাম। দেখি, ঠাকুমার কোনো ক্ষতি হয়নি। তারপর ভালো করে দেখি ঠাকুমার মুখে কাপড়ে পোকা গিজ গিজ করছে। তখন আমরা বুঝতে পারলাম, সুকুর ঠাকুমা হনুমানগুলিকে পচা আর পোকাধরা আম খেতে দিয়েছিল।

বিদিশা মহান্তি, অষ্টমশ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

গাছের কষ্ট

নীলাক্ষ পাণিগ্রাহী, পঞ্চমশ্রেণী, ইবি, মালদা।

হে বন্ধু কেটো না মোদের
যন্ত্রণা আর সহে না যে,
দিয়েছি কত মিষ্টিফল কত ছায়া
তবু নেই তোমাদের প্রাণে এতটুকু মায়া?
পেয়েছো কত ফল ফুল
প্রতিদানে তবু মেরেছো কুড়ুল,
কেটেছো, মেরেছো, জ্বালিয়েছো
তবু আমরাই তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছি জেনো।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

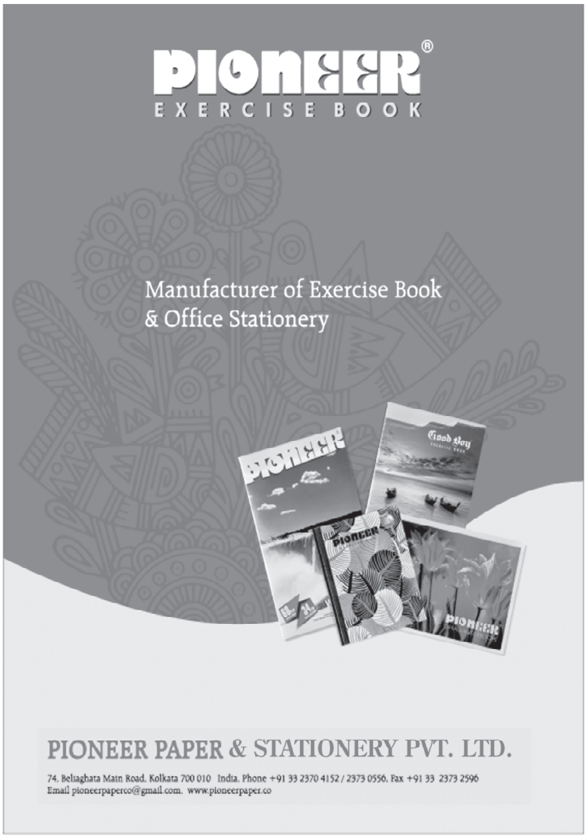

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206, 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের এগারো বছর

বস্তুগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনারও পরিবর্তন

বিমলশঙ্কর নন্দ

ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গত ২৬ মে ২০১৪ থেকে ২৬ মে ২০২৫ এই ১১ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত আছে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার, যে এনডিএ-র প্রধান দল হলো ভারতীয় জনতা পার্টি। স্বাধীন ভারতের ৭৭ বছর ১০ মাসের ইতিহাসের এই কালখণ্ডকে খুব বেশি সময় নিশ্চয়ই বলা যাবে না। ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭, ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯— এই দীর্ঘ ৩৪ বছর পরপর নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রে এককভাবে সরকার চালিয়েছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত ৫ বছর সময়কালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বে ছিল কংগ্রেস। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সময়কালে পিভি নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সরকার, ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ইউপিএ সরকার পরিচালনার প্রধান দায়িত্বও ছিল কংগ্রেসের হাতে। উপরন্তু, মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টির সরকার ১৯৭৯ সালে ভেঙে যাওয়ার পর ২৮ জুলাই ১৯৭৯ থেকে ১৪ জানুয়ারি ১৯৮০ পর্যন্ত চরণ সিংহ সরকারকে, ১০ নভেম্বর ১৯৯০ থেকে ১ জুন ১৯৯১ পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বাধীন সরকারকে ১ জুন ১৯৯৬ থেকে ২১ এপ্রিল ১৯৯৭ পর্যন্ত এইচডি দেবেগৌড়া সরকারকে, ২১ এপ্রিল ১৯৯৭ থেকে ১৯ মার্চ ১৯৯৮ পর্যন্ত ইন্দ্রকুমার গুজরাল সরকারকে সমর্থন করে ক্ষমতায় রেখেছিল কংগ্রেস। পরে সুযোগ বুঝে তাদের ক্ষমতার বাইরে বার করে দেয় সমর্থন তুলে নিয়ে। অর্থাৎ ২৪ মার্চ ১৯৭৭ থেকে ২৮ জুলাই ১৯৭৯ পর্যন্ত মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টির সরকার, ২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ থেকে ১০ নভেম্বর, ১৯৯০ পর্যন্ত ভিপি সিংহ সরকার, ১৯ মার্চ ১৯৯৮ থেকে ২২ মে ২০০৪ পর্যন্ত সময়কালের অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার (এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় ১৯৯৬ সালের ১৪ দিনের সরকার) এবং ২৬ মে ২০১৪ থেকে আজ পর্যন্ত নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতত্বাধীন এনডিএ সরকার— এই ৭৮ বছর সময়কালের মধ্যে প্রায় ৫৮ বছর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এককভাবে কিংবা জোট করে কিংবা পর্দার আড়ালে থেকে কেন্দ্রে পুতুল সরকার বসিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছে। যে কোনো অ-কংগ্রেসি সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

উপরে এত বিস্তৃত তথ্য দিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনোত্তর ভারতের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা দেওয়া। স্বাধীনতার পর প্রথম ৩০ বছর কংগ্রেস একাই ক্ষমতা ভোগ করেছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে দেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাতেই ছিল। কোনো বিরোধী দলই তখন কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জায়গায় ছিল না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সেই অবস্থাকে 'একদলীয় আধিপত্যমূলক ব্যবস্থা' বলে চিহ্নিত করেন। কংগ্রেস তখন শুধু কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে সরকার পরিচালনাই করেনি, একটি সামাজিক শক্তি হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতের আভ্যন্তরীণ নীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা, ইতিহাস চর্চা সবকিছুই গড়ে উঠেছে কিংবা পরিচালিত হয়েছে কংগ্রেসের হাতে। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে কংগ্রেসের এই আধিপত্যমূলক অবস্থান দেখে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রজনী কোঠারী সেই ব্যবস্থাকে 'কংগ্রেস সিস্টেম' বলে অভিহিত করেন।

কংগ্রেস মূলত একটি উদারনৈতিক চিন্তাধারার দল যার সঙ্গে বাম মতাদর্শের বিশেষ নৈকট্য আছে। তাই ঔপনিবেশিক শক্তি ভারত ছেড়ে

ফ ঃ ৬

চলে যাওয়ার পর দেশগঠন প্রক্রিয়ায় এদেশে বামপন্থী মতাদর্শ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতের ইতিহাস চর্চা, বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে এই বাম প্রভাবই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বাধীনতার পর ভারতের আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের কথাই ধরা যাক। স্বাধীন ভারতের বিদেশ নীতিতে জওহরলাল নেহরু জোটনিরপেক্ষতাকে একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরেন। নিজে হয়ে যান জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতা। কিন্তু জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের সঙ্গে নিজের দেশকে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনো বিরোধিতা ছিল না। কিন্তু জওহরলাল নেহরুর আভ্যন্তরীণ ও বিদেশ নীতিতে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলার কোনো ভাবনাই স্থান পায়নি। সে কাজ শুরু করেছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ১৯৬২ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে ভারত চীন সীমান্ত সংঘর্ষে ভারত যখন চীনের হাতে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়, তখন একটি দেশও ভারতের পাশে দাঁড়ায়নি। ওই যুদ্ধে কাশ্মীরের লাদাখ অঞ্চলের ৩৮ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা (আকসাই চীন) চীনের দখলে চলে যায়। ভারত আজও তা ফেরত পায়নি।

অথচ ১৯৪৯ সালে চীনে তথাকথিত কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কমিউনিস্ট চীন যাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার ভূমিকা পালন করতে পারে নেহরু তার জন্য চেষ্টার কম করেননি। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং পাকিস্তান দু' টুকরো হয়ে যায়ার পর ১৯৭২ সালের ২ জুলাই যে সিমলা চুক্তি হয়েছিল তাতে ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারতীয় বীর সেনানীদের অসমসাহসিকতায় ছিনিয়ে আনা জয়ের কোনো সুবিধা ঘরে তুলতে পারেননি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েও পরমাণু বোমা তৈরির সাহস দেখাতে পারেনি তখনকার নেতৃত্ব। দেশের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে যে ভাবনা কংগ্রেস দল বামেদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল সেটা হলো অর্থনীতির উন্নতি হবে অন্য দেশের হাত ধরে। এটা ঠিক যে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশের আর্থিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু তার সঙ্গে আর একটি ন্যারেটিভ খুব সূক্ষ্মভাবে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটা হলো ব্যক্তিগত পুঁজি মানেই খারাপ কিছু, ব্যবসায়ীরা লোক ভালো নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগ যতটা পারো নিয়ন্ত্রণ কর ইত্যাদি।

বিগত শতাব্দীর ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি এসে ভারত ব্যক্তিগত উদ্যোগের গুরুত্ব বুঝতে পারলো। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যে চীনদেশে ১৯৭৮ সালে দারিদ্র্য ছিল ৩০.৭ শতাংশ, ১৯৮৭ সালে তা কমে হয় ১৪.৩ শতাংশ, আর ২০০১ সালে আরও কমে হয় ৩.২ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৭৬ সালে দরিদ্র মানুষ ছিল ৪১.১ শতাংশ, ১৯৮৭ সালে তা কমে হয় ১৭.৪ শতাংশ, ১৯৯৬ সালে তা আরও কমে হয় ১১.৩ শতাংশ। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ দুঃসহ দারিদ্র্য এবং স্বল্প উন্নয়নের ফাঁদে আটকে ছিল। ১৯৪৭ সালে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ এদেশে প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যে ছিল, ২০০০ সালে তাতে ৫০ শতাংশের নীচে নামানো যায়নি। দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। এর দায়িত্ব স্বাধীনতা পরবর্তী কয়েক দশক নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সরকার পরিচালনা করা কংগ্রেসকেই নিতে হবে।

এই অদ্ভুত ধরনের মানসিকতা এবং নেতিবাচক ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার কাজ প্রথম করেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধান এনডিএ সরকার। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ এই ছ' বছরে একদিকে দেশের মানুষকে সুশাসন দেওয়া, অন্যদিকে এক শক্তিশালী ভারত গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে কাজ করতে শুরু করেছিল বাজপেয়ী সরকার। ১৯৯৮ সালের ১১ ও ১৩ মে পোখরানে দ্বিতীয়বারের জন্য পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে (অপারেশন শক্তি) ভারত গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দেয় তারা পরমাণু বোমা তৈরি করেছে। কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করে পরমাণু অস্ত্র ত্যাগ করতে তারা রাজি নয়। গোটা বিশ্ব দেখলো এক শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বকে। ১৯৯৯ সালের মে থেকে জুলাই কার্গিল থেকে পাক হানাদারদের সরিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনীতিকে নতুন দিশা দেখানোর কাজ শুরু হয় এক শক্তিশালী ভারত গড়ার লক্ষ্যে। বাড়তে থাকে বিদেশি বিনিয়োগ। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা এবং বিখ্যাত সোনালি চতুর্ভুজ প্রকল্পের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা যোগ করা হয়।

অটলবিহারী বাজপেয়ী পরিচালিত এনডিএ সরকার যেখানে শেষ করেছিল সেখান থেকেই শুরু করে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ২০০৪ থেকে ২০১৪ এই দশ বছর কেন্দ্রে সরকার চালিয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট। ২০০৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত এই সরকারকে সমর্থন করেছে বাম দলগুলো। যেহেতু বাম দলগুলো ছিল প্রথম ইউপিএ সরকারের প্রাণভোমরা (এ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভাষায় উঠতে বললে উঠতো, বসতে বললে বসতো), তাই বাজপেয়ী সরকার বিশ্ব অর্থনীতিতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে যে অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ শুরু করেছিল তাকে প্রায় মুলতুবি রেখে আবার সেই মান্ধাতা আমলের সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির যুগে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। তার সঙ্গে ছিল সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অজস্র দুর্নীতির অভিযোগ। কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি, টুজি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি, কয়লা বণ্টন কেলেঙ্কারি— এমন অজস্র কেলেঙ্কারির অভিযোগে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা তখন জর্জরিত। অবশ্য কংগ্রেস শাসন এবং কেলেঙ্কারি দুটো খুব সম্পর্কহীন বিষয় নয়। ১৯৯১-১৯৯৬ সময়কালে নরসীমা রাওয়ের আমলে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ঘুষ কেলেঙ্কারি, হর্ষদ মেহেতা স্টক মার্কেট কেলেঙ্কারি, রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কুখ্যাত বোফোর্স কেলেঙ্কারি ভারতীয় সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। দুর্নীতির এই মহাসাগরীয় স্রোতের মাঝখানে ছ' বছরের শাসনকালে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রমাণ করে দিয়েছিলেন ক্ষমতা ও দুর্নীতি সমার্থক নয়। বরং রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল দুর্নীতিহীন প্রশাসনের ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপন করা। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী সেটা পেরেছেন। ভারতের প্রশাসন 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'-এর ঐতিহ্যই এখন অনুসরণ করে।

গত ১১ বছরে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ভারতবর্ষকে বদলাতে শুরু করেছে। বদল আনা হয়েছে দেশের অর্থ ব্যবস্থায়, দেশের প্রতিরক্ষা নীতিতে, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নীতিতে, দেশের পররাষ্ট্র নীতিতে। এই প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা উচিত। কারণ একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এই সমস্ত দিকে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে যে জায়গাটিতে বদল আনা সম্ভব হয়েছে সেটি হলো মানসিকতা। ভারত বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ হতে পারে, এই ভাবনাটিকেই গড়ে তোলা হয়নি। দশকের পর দশক ধরে উন্নতিশীল দেশের তকমা নিয়েই আমরা খুশি থেকেছি।

গত ১১ বছরের ইতিহাস পরিবর্তনের ইতিহাস। নিজের অতীতকে না ভুলে আধুনিকতার পথে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। .. ভারত তার হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যেমন বজায় রাখবে তেমন এগিয়ে যাবে আধুনিকতার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে।

ভারত পৃথিবীর উন্নত দেশ হতে পারে, একটি বিশ্ব শক্তিতে পরিণত হতে পারে সেই মানসিকতাই তৈরি করা হয়নি। দেশবাসী অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল রাজনীতির সর্বোচ্চ স্তরে দুর্নীতি দেখতে দেখতে, জোট সরকারের টানাপোড়েন, অস্থিতিশীলতা, সরকার পরিচালনার সমস্যা, আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, পরিবারতন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে। এই মানসিকতা বদলের জন্য সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে জোর ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হয় তা দেওয়ার সাহস অটলবিহারী বাজপেয়ী ছাড়া কেউ দিতে পারেননি। বাজপেয়ীর কাজকে নরেন্দ্র মোদী শুধু এগিয়ে নিয়ে যাননি, তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। উন্নত দেশ হতে গেলে আগে নিজের দেশের মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

দেশে বিপুল দারিদ্র্য নিয়ে বিশ্বশক্তি হওয়ার স্বপ্ন না দেখাই উচিত। চীনকে আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির চর্চাকারীরা একটি বিশ্বশক্তি হিসেবেই চিহ্নিত করেন। চীন কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষের দিকেই দারিদ্র্যকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পেরেছিল। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় এসেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির ওপর। তার ফল কী হয়েছে? ২০১১ সালে ভারতে চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ২৭.১ শতাংশ, ২০২২-২৩ সালে তা কমে হয়েছে ৫.৩ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট অনুযায়ী ওই এক দশকে প্রায় ২৭ কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছে ভারত। ২০২০ সালের করোনাকালে ভারতের প্রায় ৫.৬ কোটি মানুষ নতুন করে দাবিদ্র্য সীমার নীচে চলে গিয়েছিল। তারপরও এই সাফল্য সত্যিই চমকপ্রদ। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ২০১১-১২ সালে ভারতে চরম দারিদ্র্য পীড়িত জনসংখ্যা ছিল ৩৪.৫ কোটি। ২০২২-২৩ সালে তা নেমে এসেছে ৭.৫ কোটিতে। এমনকী ২০১১-২০২৩ সালের মধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দারিদ্র্যও ৫৭.৭ শতাংশ থেকে কমে ২৩.৯ শতাংশতে নেমে এসেছে। এই সাফল্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে বিশ্ব ব্যাংক ইতিমধ্যেই দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে। আগে বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ২.৫ ডলার (প্রায় ১৮৪ টাকা) খরচের ক্ষমতাসীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। ২০২১ সালে তা বাড়িয়ে ৩ ডলার করা হয়। তারপরও ভারতে দরিদ্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এরপর ভারত যদি একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে তার ভূমিকা পালন করতে চায় তখন তাকে নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ দারিদ্র্য নিয়ে উপহাসের মুখোমুখি হতে হবে না।

নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এই দেশকে দৃঢ় পদক্ষেপে নিয়ে চলেছে আধুনিকতার পথে। তাই সাবেকি আমলের টাকাপয়সার লেন-দেনভিত্তিক অর্থনীতির বদলে মানুষকে ব্যাংকমুখী করা হচ্ছে। ১৫ আগস্ট ২০১৪, লালকেল্লা ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা চালুর ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রথম দিনই দেশের প্রায় দেড় কোটি মানুষ এই প্রকল্পের অধীনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলেন। ২০১৪ সালের ২৩ থেকে ২৯ আগস্টের মধ্যে ১,৮০,৯৬,১৩০টি অ্যাকাউন্ট খোলা হয় যাকে বিশ্ব রেকর্ডের মর্যাদা দিয়েছে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস। আগস্ট, ২০২৩-এর মধ্যে মোট জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে ৫০.৯ কোটি যাতে মোট টাকা জমা পড়েছে ২,০৩,৫০৫ কোটি টাকা টাকা। গত দু' বছরে সংখ্যাটা আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন বৃদ্ধির কথা প্রধানমন্ত্রী যখন সংসদে ঘোষণা করেছিলেন তখন অনেকে উপহাস করেছিল। এদেশের দরিদ্র মানুষ, ছোটো ছোটো ব্যবসায়ী, হকার প্রভৃতিরা ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশনে কতটা অভ্যস্ত হবে সে নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। আজ ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশনে ভারত বিশ্বের এক নম্বরে। অনেক কমেছে নগদের ব্যবহার। প্রান্তিক মানুষদের আচরণ- মানসিকতার পরিবর্তন এসেছে। তারা আর নিজেদের প্রান্তিক মনে করে না। এই মানুষদের নিয়েই উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বপ্নকে এই মানুষগুলোর মধ্যে সঞ্চালিত করতে পেরেছেন।

গত ১১ বছরের ইতিহাস পরিবর্তনের ইতিহাস। নিজের অতীতকে না ভুলে আধুনিকতার পথে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। কয়েকশো বছরের পুরোনো শ্রীরামমন্দির বিতর্ককে সংবিধান এবং আইনের আওতার মধ্যে সমস্যা মিটিয়ে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে মোদী সরকার। অযোধ্যার ভব্য শ্রীরামমন্দির হয়ে উঠেছে এদেশের এবং অন্যান্য আবেগকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে। আবার চন্দ্রযান-৩ তৈরি করে তাকে চাঁদের এমন স্থানে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নামাতে পেরেছেন যা পৃথিবীর কোনো দেশ আগে পারেনি। ভারত তার হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যেমন বজায় রাখবে তেমন এগিয়ে যাবে আধুনিকতার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে। এটাই দেশের মানুষের দাবি। দেশের মানুষের মধ্যে এই মানসিকতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। □

পশ্চিমি নারীবাদ ভারতের বিরুদ্ধে এক গভীর সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র

ড. অর্পণ দাস

১৮৩৭ সাল। তৎকালীন ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত দার্শনিক চার্লস ফুরিয়ের সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি আনলেন। সমাজবিদ্যার ইতিহাসে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজম তথা আদর্শ সমাজতন্ত্র বলে পরিগণিত হয়। ইতিপূর্বে মেরি উলস্টোনক্র্যাফট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'A Vindication of the Rights of Woman' (1792)-এ তিনি নারীদের শিক্ষা ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন। সামাজিক অসাম্যের মূলে কোথাও যে একটা অভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে তা ফুরিয়েরের বহু আগেই প্রকাশ হতে শুরু করছিল। ফুরিয়ের বিশ্বাস করতেন— সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য নারীজাতিকে সমান অধিকার দেওয়া জরুরি। কারণ বৈষম্যপূর্ণ সামাজিক কাঠামো কোনোভাবেই সংহতির বার্তাবহ হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি 'feminisme' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন। এরপর ১৮৫০-এর দশকে শব্দটি ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহৃত হতে শুরু করলেও তার বেশি ব্যবহার তখনো ছিল না।

১৮৯০-এর দশকে ইউরোপ ও আমেরিকার নারীরা তাদের ভোটাধিকার, শিক্ষা ও আইনগত অধিকারের দাবি নিয়ে সংগঠিতভাবে আন্দোলনে নামেন। যুক্তরাজ্যে এমেলিন প্যাঙ্কহার্স্ট ছিলেন এই আন্দোলনের নেত্রী। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে সুসান বি. অ্যান্থনি এবং এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন ছিলেন এই আন্দোলনের সামনের সারিতে। এই সময়কালে 'feminism' শব্দটির বার বার উচ্চারিত হয় বিভিন্ন আলোচনা সভায় এবং পত্রপত্রিকায়। এরপর থেকেই নারী অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই 'feminism' শব্দটি সমার্থক হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের মূল মন্ত্র ছিল 'No taxation without representation'। এর পাশাপাশি পেশাগত ক্ষেত্রে ডাক্তারি, আইন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীদের অংশগ্রহণ সেইসময় প্রায় ছিল না বললেই চলে। নারীদের এই অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে তুলতে চেয়েছিলেন এই আন্দোলনের নেত্রীরা। সম্পত্তির অধিকার, সন্তানের দেখভালের অধিকার এবং ডিভোর্সের অধিকার চেয়ে নারীরা পথে নামেন। ইউরোপের ইতিহাসে এই আন্দোলনকে নারীবাদের প্রথম ঢেউ বলে উল্লেখ করা হলো।

খুব স্বাভাবিকভাবেই সেদিন ইউরোপীয় সমাজের ভেতর থেকেই এই সমানাধিকারের আহ্বান এসেছিল এবং মানবাধিকার প্রসঙ্গ হেতু বিবেচনা করলে এইসকল দাবিদাওয়াগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল ন্যায্য। কিন্তু ইউরোপের মূলগত সমস্যার উপর ভিত্তি করে সেটিকেই সমগ্র বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের মূলগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতাটি ছিল একদেশদর্শী ও অবান্তর।

> **হিন্দু নারীরা'ই হবে আমাদের আধার। সক্ষম ও সশক্ত মাতা, জায়া ও কন্যাই হলো ভারতবর্ষীয় নারীদের আদর্শ। এই নারীরা শক্তিতে শাক্ত, ত্যাগে বৈষ্ণব এবং স্থিতিতে শৈব— অত্যুচ্চ ভারতমাতার আদর্শই এই নারীদের মূলাধার।**

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জন স্টুয়ার্ট মিল লিখলেন 'The Subjection of Women' শীর্ষক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি সরাসরি বিবাহ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কামান দাগলেন। তিনি জানালেন, বিবাহ ব্যবস্থা সামাজিকভাবে নারীদের অবদমিত করে রাখে। স্টুয়ার্ট মিল বিবাহের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি, তিনি বিবাহকে এমন একটি ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছিলেন যেখানে নারীদের 'পর' করে রাখার প্রবণতা ছিল ভয়ংকর। জন স্টুয়ার্ট মিলের এই মতকে সমর্থন জানালেন তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট টেলরও। ইউরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই নারীবাদী ধারণাটি বস্তুতপক্ষে উদারপন্থার প্রভাবসঞ্জাত। এটিই নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ। এরপর মানচিত্রে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন মার্কসবাদীরা। মিলের বিবাহ সন্দর্ভ বা প্রেক্ষিতটিকে আত্মপক্ষে নিয়ে তারা কতকগুলি নতুনতর পরিভাষার জন্ম দিলেন। বলা ভালো, কতকগুলো পুরনো পরিভাষাকে নতুনতর অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেন। পিতৃতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র, জেন্ডার --- এই পরিভাষাগুলি নতুনতর অর্থ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলো এবং সমগ্র নারীবাদী আন্দোলনটি সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অংশ হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করল। ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসের ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা গ্রন্থ ''The Origin of The Family, Private Property And State''-এ তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গিটির নির্মাণ করেন সেটিই পরবর্তীতে নারীবাদী

আন্দোলনের প্রধান রসদ হয়ে ওঠে। মার্কসবাদী দর্শনে আদিম সাম্যবাদী সমাজের কল্পনা করা হয়। তারা মনে করেন, এই সমাজে সম্পত্তির কোনো ধারণা ছিল না। ফলে সম্পদ, শ্রম ও মর্যাদায় তুল্যমূল্যভাবে একটি সাম্যভাব বজায় ছিল। পরিবারগুলি ছিল মূলত মাতৃতান্ত্রিক। সুতরাং, পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারত না। পরবর্তীতে কৃষিকাজ ও পশুপালনের সূত্রপাত হলে অতিরিক্ত সম্পদের সৃষ্টি হলো এবং তখন থেকেই অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেল। এখন এই এতখানি সম্পদ রক্ষা করবে কে? পুত্রসন্তান। অতএব, জন্ম হলো উত্তরাধিকারের।

দীর্ঘ দুই শতক ধরে এইসব ভিত্তিহীন তত্ত্বের মায়াজালে আটকে পড়লেন বহু শিক্ষিত মানুষ। সমাজতত্ত্বের প্রবল পণ্ডিতরাও অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও খুঁজে পেলেন না অতীতের সেই সাম্যবাদী সমাজের সামান্য নিদর্শনটুকুও। গল্পকথার মতোই তা সামান্য বিশ্বাসী মানুষের মনে দাগ কাটে। সর্বশেষ, এঙ্গেলস সিদ্ধান্তে এলেন, "The overthrow of mother-right was the world-historic defeat of the female sex" অর্থাৎ 'মাতৃতন্ত্রের পতন ছিল নারী লিঙ্গের বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়।' এঙ্গেলস এবং তাঁর ইকোনমিস্ট বন্ধু কার্ল মার্কস এইভাবে মানুষের মনে, বিশেষত স্ত্রীলোকের মনে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের নির্মাণ করলেন। অসাম্যের ক্ষত। আজকের দিনে সেই ক্ষতটিই নারীবাদের আড়ালে পুষ্ট হচ্ছে। আরও পরবর্তীকালে, মার্কসবাদী তত্ত্বে নারীকে স্থাপন করা হলো পরিবার ও পুরুষের বিরুদ্ধে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ হলো 'The Second Sex' নামক গ্রন্থটি। রচয়িতা সিমোন দ্য বোভেয়া। তাঁর এই লেখাটিতে পুরুষকে সমস্ত অসাম্যের পিছনে কার্যকর কারণ হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। অন্যদিকে, ঋতুচক্র, গর্ভধারণ ও যৌনতা— এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন এক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করা হলো যা পরবর্তীতে নারীদের মনে এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গেল। তার দেখানো নারীবাদ লিঙ্গবৈষম্যকে সর্বাধিক প্রাচীন ও অবদমনকারী বলে বিবেচনা করল।

হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে কেবল পুরুষতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র বলে দেগে দেওয়ার মধ্যে তারা নিশ্চিত করতে চায় হিন্দু পরিবারগুলির ভাঙনকে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নামে তারা এদেশের বুকে সংস্কারহীন বেহায়াপনাকে চালিয়ে দিতে চায়।

বস্তুতপক্ষে, সিমোন দ্য বোভেয়ার দেখানো পথ ধরেই লিঙ্গ রাজনীতি তথা জেন্ডার পলিটিক্সের সূত্রপাত হলো। লিঙ্গ-বৈষম্যকে অতিক্রম করার জন্যে কেউ কেউ নারীকে পুরুষের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন। তারা মনে করতে শুরু করলেন যে নারীর নমনীয়তা, প্রজনন ও যৌন ক্ষমতাই তার সামাজিক অবদমনের কারণ। ফলে, তারা নারীত্ববর্জিত নারীর ধারণাকেই আরও বেশি করে সমাজের মূল স্তরে নিয়ে আসার প্রয়াস করল। নারী আর পুরুষের সহযোগী নয়, নারী হয়ে উঠল তার প্রতিস্পর্ধী ও প্রতিযোগী। ফলে, সমাজে যা 'ভালো মেয়ে'-র ধারণা বলে প্রচলিত ছিল, আক্রমণ করা হলো তাকেই। প্রজনন প্রক্রিয়া, সন্তান প্রতিপালনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়াকে সমাজের মূল ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস দেখা দিল। নারীর স্বাধীনতাকে অব্যর্থ রাখতে সমর্থন করা হলো সমকামকে। যে কোনো রকমের যৌনসম্পর্ক যা সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে তাকেই সমর্থন জানাতে শুরু করল বোভেয়ারের দেখানো এই নারীবাদের দল। জে জরিন (প্রকৃত নাম জো ফ্রিম্যান) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ 'The Tyranny of Structurelessness'-এ খুব স্পষ্ট ও সুচারুভাবে নারীদের এই নারীত্বের ধারণাটিকে ত্যাগ করতে বললেন। তার কাছে নারীত্বের ধারণা হলো সর্বাংশে আবেগসর্বস্ব ও ভ্রান্ত। অতএব, তা পরিত্যাজ্য।

নারীবাদের আলোচনায় এই বিষয়টিকে Androgyny বলে। এর ফলাফল আজ চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আজকের সমাজে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে নারীরা কৃত্রিম পদ্ধতিতে সন্তান উৎপাদনে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠছেন। সন্তান না নেওয়ার প্রবণতা, জন্ম-নিরোধক পদ্ধতি অনুসরণের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ এবং গর্ভপাতের প্রবণতা দিনে দিনে বাড়ছে। পশ্চিমি দেশগুলিতে এই প্রবণতা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আসলে, নারীবাদ মনে করে প্রজনন ব্যবস্থা শুধুমাত্র নারীকে অবদমিতই করে না, তাকে শোষণও করে। আজকের দিনে দেখা যায়, নারীরা বেশি করে পুরুষের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। এখন পুরুষের যে বৈশিষ্ট্যগুলি তারা গ্রহণ করছে স্বভাবতই সেগুলি একটিও ভালো বৈশিষ্ট্য নয় এবং আমাদের দুর্ভাগ্য এখানেই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আজকের নারীরা ধীরে ধীরে ধূমপান, মদ্যপান, বহুসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি অত্যধিক আগ্রহী হয়ে উঠছে। আজকের দিনে নারীবাদী দৃষ্টিতে সমকামিতাকে শুধুমাত্র যৌনকর্ম হিসেবেই সমর্থন জানানো হচ্ছে না, একে পুরুষের আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ হিসেবে প্রোমোট করার প্রয়াস চলছে।

জিলা আইজেনস্টাইন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার গ্রন্থ 'Capitalism Patriarchy and The Case For Socialist Feminism'-এ খুব স্পষ্টভাবে নারী শোষণের মূলে দুটি বিষয়কে কার্যকরী কারণ হিসেবে উল্লেখ করছেন— একটি হলো পুরুষের আধিপত্যবাদ এবং অন্যটি হলো ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ। এভাবে ধীরে ধীরে মার্কসপন্থী নারীবাদীরা এমন একটি ফাঁদের নির্মাণ করছেন যার দ্বারা মার্কসবাদী লক্ষ্য সিদ্ধ হয় এবং নারীকে পরিবারের বিরুদ্ধে খাড়া করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। হেইডি হার্টম্যান (১৯৯০), তিনিও সমজাতীয়

ন্যারেটিভকেই সামনে রাখছেন তার গ্রন্থ ‘The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism’-এ। তিনি নারীর উপর শোষণের দুটি মানদণ্ড নির্ধারণ করছেন— একটি হলো অর্থনৈতিক মানদণ্ড এবং অপরটি হলো পিতৃতান্ত্রিক মানদণ্ড। এইভাবে ধীরে ধীরে এমন একটি ন্যারেটিভের নির্মাণ করা হয় যেখানে নারীকে সমাজে ‘Other’ অর্থাৎ ‘পর’ হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস চলে। এই প্রয়াসের পাশাপাশি চলল নারীকে রাজনৈতিক বিষয় করার প্রয়াস। ১৯৭০-এর দশকেই ক্যারল হানিশ স্লোগান দেন— ‘পার্সোনাল ইস পলিটিক্যাল’ অর্থাৎ যা কিছু ব্যক্তিগত সে সমস্তই রাজনৈতিক। ধীরে ধীরে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে ফ্রয়ডীয় সাইকো- অ্যানালিসিস এবং পোস্ট মডার্ন অ্যাপ্রোচ। এই ধারায় নারীকে মজুরীহীন শ্রমিক হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতা শুরু হলো।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তান প্রতিপালনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবেগপূর্ণ কাজের পিছনেও পিতৃতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও লিঙ্গবৈষম্যের মতো বিষয়গুলি জুড়ে আছে। ডরোথি স্মিথ মার্কস এবং মিশেল ফুকোর ক্ষমতা তত্ত্বের অভিমুখ থেকে নারীকে পুরুষের বিপ্রতীপে বসানোর প্রয়াস চলল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। এর পাশাপাশি সম্পর্কের সমস্ত ধরনের ধারণার মধ্যে লিঙ্গ-রাজনীতিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীর্যকভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। সিলভিয়া ওয়ালবি তাঁর গ্রন্থ ‘Theorising Patriarchy’-তে বললেন, ‘পিতৃতন্ত্র হলো সামাজিক কাঠামো ও রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিপীড়ন করে এবং শোষণ করে’। একথা ঠিক যে একটা সময় তৎকালীন পরিস্থিতির কারণে ভারতবর্ষীয় সমাজে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নারীকে সেভাবে সামনে এগিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়নি কিন্তু তার মানে এটাও নয় যে সর্বত্র নারীর প্রতি দমনমূলক আচরণ করা হয়েছে, বরং, সত্য এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি কোথাও একটা বিদ্যমান ছিল।

ভারতবর্ষীয় সমাজে আজ পিতৃতন্ত্রের নামে যার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সুচারুভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে সেটি হলো পরিবার। ভারতবর্ষ মূলগতভাবে পরিবারভিত্তিক দেশ। আসলে পরিবারকে আক্রমণ করলেই ভারতবর্ষকে আক্রমণ করা খুব সহজ হয়ে পড়ে। এর জন্য কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, খুনোখুনির প্রয়োজন হয় না, শুধু প্রয়োজন হয় মতাদর্শকে খুব স্থির মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠা করার। বর্তমানে নারীবাদের নামে ঠিক এইভাবেই ন্যারেটিভ সেট করার কাজ চলছে। এদেশের বুকে কমিউনিস্টরা খুব সন্তর্পণে এই কাজটি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন। খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আজ এই দেশে দলিত ভাবধারা, নারীবাদী ভাবধারা, জেন্ডার সেনসিটিভিটি, সংখ্যালঘু রাজনীতি, জাতিবাদী রাজনীতি— সমস্ত কিছুকেই হিন্দুত্বের বিপরীতে দাঁড় করানোর প্রয়াস চলছে। দলিত নেতাদের একাংশ নিজেদের হিন্দু আইডেন্টিটিকে পিছনে সরিয়ে রেখে দলিত আইডেন্টিটিকে সামনে তুলে ধরছেন। শুধু তাই নয়, বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে উদ্ধৃত করার প্রয়াস চলছে, অথচ সমগ্র বাবাসাহেব আম্বেদকরের ভাবনাকে গ্রহণ করার সামর্থ্য এদের কারোরই নেই।

অন্যদিকে, নারীবাদের অত্যধিক বাড়বাড়ন্তের ফলে মূলত হিন্দু পরিবারগুলি আজ সব সর্বাধিক মাত্রায় ভাঙনের মুখে পড়েছে। হিন্দু পরিবারগুলিতে ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়েছে, গর্ভধারণের সংখ্যা কমেছে। অন্যদিকে অতি সাম্প্রতিককালে ‘সিঙ্গেল মাদার’ নামে একটি নব্য ধারণাকে ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কখনো এটা ভাবা হচ্ছে না যে সন্তানের জীবনে মায়ের যেমন প্রয়োজন আছে, ঠিক তেমনই বাবারও প্রয়োজন আছে। আসলে, প্রোডাক্ট হিসেবে বাবাকে বাজারে বিক্রি করা যায়নি বলে অথবা তথাকথিত নারীবাদীদের দৃষ্টিতে পুরুষতন্ত্রের অভিমুখ ‘বাবা’ হওয়ার দরুন সন্তানের বেড়ে ওয়ার প্রক্রিয়ায় বাবার ভূমিকাকে লঘু করে দেখার চেষ্টাও খুব পদ্ধতিগতভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। এই সমস্ত ন্যারেটিভগুলি কিন্তু পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, বরং একটা গোটা ইকো-সিস্টেমের সর্বাংশের ক্ষেত্রিক প্রতিফলন মাত্র। এই দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সন্দর্ভটিকে ভাঙার জন্য তারা এইভাবে নিত্যনতুন ‘Praxis’-এর জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। বামপন্থী ইকো-সিস্টেমে তত্ত্বকে কাজে পরিণত করার নামই হলো Praxis। এই দেশে বামপন্থা এরকম বহুবিধ Praxis-এর দ্বারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সামাজিক বাস্তবতাটিকে নির্মাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে, তথাকথিত মুসলমান পরিবারগুলিতে কিন্তু এই ভেদকামী নারীবাদ আশ্রয় বা প্রশ্রয় কোনোটাই পায়নি। ফলে, তাদের সমাজের অভ্যন্তরে সেরকম ভাঙন ধরেনি, এমনকী সামাজিক শৃঙ্খলায় সেরকম অবনতিও পরিলক্ষিত হয়নি। মার্কসবাদ হিন্দুদের ঘরের ছেলে-মেয়েদের নাস্তিক করে তুলল বটে কিন্তু মুসলমানদের ছেলে-মেয়েরা রয়ে গেল অতিশয় মজহবি হয়েই।

এই দেশের সামাজিক পরিসরে নারী-পুরুষের মধ্যে কর্মের বিভাজন বহু আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল। তার মানে আবার এটাও নয় যে এই শ্রম বিভাজনের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য কাজ করত। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, বিশ্ববারা, ঘোষা, লোপামুদ্রার মতো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকার উপস্থিতি খুব স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে হিন্দু সমাজের সর্বাত্মকতাকে। যারা বলেন, হিন্দু সমাজে নারীকে অন্তঃপুরবাসিনী, পর্দানসীন করে রাখা হতো তারা বোধহয় প্রকৃত ইতিহাসের সম্মুখীন হননি। ইসলামি আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা, ধর্ষণ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। সূর্যাস্তের পর যে সমাজে কোনো প্রকার আচার-ক্রিয়া নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হতো, কখনো কেউ কি ভেবে দেখেছেন যে বিবাহের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাত্রিকালে সম্পন্ন কেন হয়? আগে হিন্দুদের বিবাহ-কাজ দিনেরবেলাই সম্পন্ন হতো। দক্ষিণ ভারতে এখনো এর নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্তু সমগ্র উত্তর, পশ্চিম, উত্তর-মধ্য ও পূর্বভাগে এই প্রক্রিয়াটি স্থানান্তরিত হলো রাত্রিকালে। কারণ ইসলামের আঘাত সর্বাধিক পরিমাণে এই সমস্ত অঞ্চলেই ধেয়ে এসেছিল। এর পরিণতিস্বরূপ,

ইসলামিক পর্বে অত্যন্ত গোপনে রাতের অন্ধকারে হিন্দুদের সমস্ত বিবাহ-কাজগুলি সম্পন্ন হতো। না হলে নবাব-বাদশার সেপাই-সাস্ত্রীরা এসে 'বিবাহ কর', 'জিজিয়া' প্রভৃতি ধার্য করত। ইসলামিক ইতিহাসে এইসব কর-ব্যবস্থা চালু হয় উমাইয়া খিলাফতে।

ভারতবর্ষে আলাউদ্দিন খিলজি, ফিরোজ শাহ তুঘলক, এমনকী ঔরঙ্গজেব এইসব কর-ব্যবস্থাকে বলপূর্বক সচল রাখে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'-তে এসবের উল্লেখও আছে। ধর্ষণ এই দেশে জন্ম নেওয়া ব্যাধি নয়। ছিলও না। ধর্ষণ নামক অপশব্দটির আমদানি হয়েছে ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের মূল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু মূলত ছিল হিন্দু মহিলারা। এদেশে সতেরোবার শুধুমাত্র সোমনাথ মন্দিরে আক্রমণ হয়েছে। সতেরোবার আক্রমণের শেষে নিশ্চয়ই কোনো মন্দির আর ধন-সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকতে পারে না! তাহলে এই আক্রমণ কেন? কী উদ্দেশ্যে? উদ্দেশ্য এখানে মূলত তিনটি— প্রথমত, কাফের হিন্দুদের মনের ভয়কে চিরস্থায়ী করে রাখা; দ্বিতীয়ত, কাফেরদের হত্যা করা অথবা দাসে পরিণত করা এবং তৃতীয়ত, কাফেরদের রমণীদের বলপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া অথবা বাগদাদ ও দামাস্কাসের পতিতালয়ে চড়া দামে বিক্রি করে দেওয়া। এমতাবস্থায়, ধীরে ধীরে হিন্দুদের গৃহাভ্যন্তরে কর্মের বিভাজনে যে পরিবর্তন ঘটে তার পিছনে ঘটে যাওয়া এইসব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলিকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। 'হিন্দুকুশ পর্বত' নাম আজও এইসব হিন্দুহত্যার ('কুশ' অর্থে হত্যা) অতীত অত্যাচারের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। হিন্দু রমণীদের ঘোমটা প্রথার মধ্যেও আসলে এই 'ইনসিকিউরিটি'র মনোভাবগুলিই প্রথাতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারতবর্ষীয় সমাজে এইসব অতীত ঘটনার পরিণামস্বরূপ নারীদের অবস্থান ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ইসলাম আক্রমণের পূর্বের ভারতবর্ষ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ।

ভারতবর্ষের স্বভাব ইউরোপের মতো নয়। সুতরাং, ইউরোপীয় মানদণ্ডে ভারতবর্ষকে বিচার করলে তাতে ভারতবর্ষের মূল স্বভাবকে পরিত্যাগ করতে হয়। ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে সুদীর্ঘকাল ধরে আমরা এইভাবে বয়ে নিয়ে যেতেও পারি না। পাশ্চাত্য চোখ খুলতে বললে আমরা চোখ খুলব আর তারা চোখ বন্ধ করতে বললে আমরা চোখ বন্ধ করব, সেসব মেনে নেওয়ার দিন আজ আর নেই। নিতান্তই অভাব না থাকলে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। অন্ততপক্ষে প্রায় পাঁচহাজার বছরের বেশি পুরনো ভারতের এই সভ্যতা— বর্তমানে একমাত্র জীবিত এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে অপরিবর্তিত এই প্রাচীন সভ্যতা। আমাদের নিজস্ব কিছু মূল নিষ্কর্ষ আছে। এমন নয় যে, সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বহমান এই সভ্যতায় কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দেখা যায়নি! ছিল। কিন্তু আমরা সে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে নিজেরাই অতিক্রম করে এসেছি। এই দেশে নারী জাতির স্বরূপ হলেন বঙ্গের বুকে বেড়ে ওঠা সামান্য গৃহিণী থেকে যশস্বিনী দেশমাতৃকার সাধিকা দেবী চৌধুরাণী; কাশ্মীরের শৈলপ্রভা বংশের অন্তর্ভুক্ত রানি দিদ্দা; গোণ্ডবংশীয় রাজন্যা এবং ভোগেলখণ্ডের শাসক রানি দুর্গাবতী; কর্ণাটকের হিন্দু রাজবংশীয়া রানি চেন্নাম্মা; বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মহীয়সী রানি ও 'মাধব বিজয়' কাব্যের রচয়িতা রানি গঙ্গাদেবী, অথবা দ্বাদশ শতকের শৈব সাধিকা ও ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম মুখ আক্কা মহাদেবী।

তাঁদের বাইরে মালওয়া অঞ্চলের প্রশাসিকা অহল্যাবাঈ হোলকর, বঙ্গের রানি ভবানী, রানি ভবশঙ্করী, রানি রাসমণি, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই অথবা সাবিত্রীবাই ফুলের মতো ব্যক্তিত্বরাই হতে পারেন এই দেশের নারীদের আদর্শ যাঁরা তাঁদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে এবং প্রসাশনিক দক্ষতার মাধ্যমে এই দেশের সাংস্কৃতিক-সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপটটির রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। ভারতীয় তথা হিন্দু নারীদের প্রেরণার ভরকেন্দ্রটিই হলো মাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ধর্মীয় ভাবনা ও সাংস্কৃতিক চেতনা দ্বারা বেষ্টিত এক শক্তির সাধনক্ষেত্র। এই নারীজগৎ স্বাধীনতা ও ন্যায়ের সমন্বয়ে গড়া এবং অধ্যাত্ম দ্বারা আবৃত। হিন্দু নারীরা নিজেকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে না, সে নিজেকে দেখে পুরুষের সহযাত্রী ও সহগামী হিসেবে। এই নারীদের আদর্শ 'হিন্দু পরম্পরা'। স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে 'হিন্দু নারী' ভিন্ন আর কোনো ভাবনাই এই দেশের বৈভবকে ধারণ করতে সক্ষম নয়। সেই বৈভবের পথেই আমরা রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বদের পেয়েছি। ভারতবর্ষীয় আধুনিক নারীদের আধুনিক ভিত্তিপ্রস্তরটি তাঁদের হাত দিয়েই স্থাপিত হয়েছে। তাঁরা কেউই ইউরোপকে অন্ধভাবে গ্রহণ করেননি বরং তাকে ভারতবর্ষের আলো-বাতাসের উপযুক্ত করে আত্মস্থ করেছেন। যতটুকু প্রয়োজন ছিল, ততটুকুই। আজ পশ্চিমি নারীবাদ নারীকে মাতৃত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তার উদ্দেশ্য সমাজের অভ্যন্তরে অবক্ষয়ের সৃষ্টি করা।

হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে কেবল পুরুষতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্র বলে দেগে দেওয়ার মধ্যে তারা নিশ্চিত করতে চায় হিন্দু পরিবারগুলির ভাঙনকে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের নামে তারা এদেশের বুকে সংস্কারহীন বেহায়াপনাকে চালিয়ে দিতে চায়। এই পশ্চিমি নারীবাদের মূল উদ্দেশ্য নারীকে শক্তির আধার হিসেবে গড়ে তোলা নয়, এর উদ্দেশ্য হলো নারীকে হিন্দু সমাজের ভাঙনের ক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা। এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেই আমাদের নারীজাতিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে মানুষের মনে। নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করতে হবে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। 'হিন্দু নারীরা'ই হবে আমাদের আধার। সক্ষম ও সশক্ত মাতা, জায়া ও কন্যাই হলো ভারতবর্ষীয় নারীদের আদর্শ। এই নারীরা শক্তিতে শাক্ত, ত্যাগে বৈষ্ণব এবং স্থিতিতে শৈব--- অত্যুচ্চ ভারতমাতার আদর্শই এই নারীদের মূলাধার। আমাদের এই আদর্শকেই সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে তত্ত্ব ও তথ্যনিষ্ঠভাবে প্রতিপন্ন করতে হবে। পশ্চিমি নারীবাদের ফাঁদে কোনো ভাবেই পা দেওয়া চলবে না।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(২৫)

নাগপুর ন্যাশনাল ইউনিয়ন

বিশ্বপটের রাজনৈতিক চিত্রের তখন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায় শেষ, মিত্রশক্তির ভাগীদার ইংরেজ জয়লাভ করেছে। মুসলমানদের সাহায্য নিয়ে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করলেও জার্মানির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে ইংরেজ মিশর, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, আরব ইত্যাদি রাজ্য তৈরি করে দিল। এর ফলে মুসলমানদের তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের প্রধান তুরস্কের খলিফা গদিচ্যুত হয়। ফলে ইংরেজদের প্রতি ক্ষেপে গেল মুসলমানরা। ভারতেও তার প্রভাব এসে পড়ল। গঠিত হলো 'খিলাফত সমিতি'। মুসলমানদের ক্ষোভ ও খিলাফত আন্দোলন সম্পর্কে তদন্ত এবং ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য জাস্টিস স্যার সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে 'সিডিশন এনকোয়ারি কমিটি' (রাজদ্রোহ তদন্ত সমিতি) গঠিত হয়। তিনি একটি অন্যায় আইন তৈরি করেন যা 'রাওলাট অ্যাক্ট' নামে কুখ্যাত। এই আইনে বলা হয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে বিনা তদন্তে ও বিচারে যেকোনো কাউকে আটক করার অধিকার সরকারের থাকবে।

এই জঘন্য আইনের প্রকৃত রূপ যদি মানুষ জানতে পারে, তবে তারা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় হবে এই ধারণায় ডাক্তারজী এই আইনটির প্রতিলিপি ছেপে মধ্যপ্রান্তে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ঘটে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। ইংরেজের এমন বর্বরতায় সমগ্র দেশজুড়ে বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটল।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হলো, তাতে খিলাফত সমিতির শওকত আলি ও মৌলানা মহম্মদ আলি গান্ধীজীর সহায়তায় খিলাফত আন্দোলন শুরু করল। যদিও খিলাফত আন্দোলন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল ভিন্ন বিষয়, তবুও গান্ধীজী এক বিচিত্র কল্পনার বশে হিন্দু- মুসলমান ঐক্যের কথা বলে হিন্দুসমাজকে খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং নিঃশর্ত সমর্থন করতে বললেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এই খিলাফতি ভাইদের তুরস্কের বিষয়ে যত চিন্তা ছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে তাদের অত ভাবনা ছিল না। হিন্দুস্থানের ভালো-মন্দের সঙ্গে তাদের কোনো সংশ্রব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারা গান্ধীজীকে ব্যবহার করতে লাগল। স্বাভাবিকভাবেই দেশের জাতীয় স্তরের নেতৃত্ব এই বিষয়টিকে সমর্থন করতেন না।

ডাক্তার হেডগেওয়ারও ছিলেন সেই দলে। বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিপ্লবের কাজে কিছুটা ভাঁটা এলেও লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের অনুগামীদের দ্বারা মধ্যপ্রান্তে 'রাষ্ট্রীয় মণ্ডল' নামে গঠিত সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে ডাক্তারজী কাজ করতেন। এটা ছিল কংগ্রেসেরই অঙ্গ, কিন্তু এখানেও ডাক্তারজীর সঙ্গে চিন্তার একটা অমিল দেখা দিল।

রাষ্ট্রীয় মণ্ডলের বয়স্ক নেতৃবৃন্দ বা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল 'ঔপনিবেশিক স্বরাজ্য'-এর কথা; কিন্তু ডাঃ হেডগেওয়ার সকলের সামনে 'পূর্ণ স্বরাজ' বা শুদ্ধ স্বাধীনতার কথা বলে প্রচার করতে লাগলেন। এই মতদ্বৈতর কারণে রাষ্ট্রীয় মণ্ডলেরই বিশিষ্ট নেতৃত্ব যথা— শ্রী বোবড়ে, শ্রী বিশ্বনাথ কেলকর, শ্রী বলবন্তরাও মণ্ডলেকর, শ্রী চোড়ঘরে প্রমুখকে নিয়ে তিনি নতুন একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম হলো— 'নাগপুর ন্যাশনাল ইউনিয়ন'।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস